পথে পথে

স্বাদু স্বাদু পদে পদে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ত্রিবেণী প্রকাশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : ফাল্গুন, ১৩৬৭

প্রকাশক

কানাইলাল সরকার

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর

সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

তাপসী প্রেস

৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ

অন্নদা মুন্সী

ব্লক

সিগনেট ফটো টাইপ

ব্লক মুদ্রণ

স্কোয়ার প্রিণ্টার্স

বাঁধাই

ইউনিভার্সাল বুক বাইণ্ডার্স

দাম : দুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

অচিন্ত্যকুমারের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (১,২,৩,৪), পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি, কবি শ্রীরামকৃষ্ণ, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (১), কল্লোলযুগ, অমাবস্যা, প্রিয়া ও পৃথিবী, নীল আকাশ, বেদে, আকস্মিক, কাকজ্যোৎস্না, প্রথম প্রেম, জননী জন্মভূমিশ্চ, বিবাহের চেয়ে বড়, প্রাচীর ও প্রান্তর, আসমুদ্র, উর্ণনাভ, ঢেউয়ের পর ঢেউ, তৃতীয় নয়ন, তুমি আর আমি, প্রচ্ছদপট, ইন্দ্রাণী, অনন্যা, ছিনিমিনি, নেপথ্য নবনীতা, মুখোমুখি, অন্তরঙ্গ, যায় যদি যাক যে যাই বলুক, পাখনা, একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী, রূপসী রাত্রি, হিয়ে হিয় রাখনু, টুটাফুটা, ইতি, অধিবাস, রুদ্রের আবির্ভাব, অকাল বসন্ত, সঙ্কেতময়ী, দিগন্ত, পলায়ন, কালো রক্ত, কাঠ খড় কেরাসিন, আসমান জমিন, ইনি আর উনি, নায়ক-নায়িকা, প্রজাপতয়ে, সারেঙ, যতনবিবি, চাষাভুষা, হাড়ি মুচি ডোম, ডবলডেকার, মগের মুলুক, হুইসল, এক অঙ্গে এত রূপ, নতুন তারা, আকাশ প্রদীপ, সবুজনিশান, ডাকাতের হাতে, উঁচু নীচু, দুই ভাই, ঘোরপ্যাঁচ, সাপ খেলাবার বাঁশি, ঝড়ের যাত্রী, প্যান, আধুনিক সোভিয়েট গল্প, মুক্ত দ্বার

সূচী

॥ কাঁটার মুকুট ॥

'প্রত্যেক মামলার দুটো দিক আছে। একটা তথ্য বা ঘটনার দিক, আরেকটা আইনের দিক। ঘটনার চূড়ান্ত বিচারক আপনারা। ঘটনা সম্বন্ধে আমি যদি কোন মত প্রকাশও করি, তা আপনারা মানতে বাধ্য নন। ঘটনা সম্বন্ধে আপনাদের মতামতই বলবৎ হবে। কিন্তু আইন সম্বন্ধে আমি যা নির্দেশ দেব তা আপনাদের মানতে হবে—এই আইনের নির্দেশ।'

এতক্ষণ সব ঝিমোচ্ছিল, এবার জুরিবাবুরা সচকিত হল। সেসন জজ সহদেব সরকার মৌখিক চার্জ দিচ্ছে।

'প্রত্যেক ফৌজদারি মামলায় আসামীকে নির্দোষ ধরে নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হবেন। যেহেতু তার নামে অভিযোগ হয়েছে, পুলিস চার্জসিট দিয়েছে, কিংবা প্রাথমিক তদন্ত করে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে দায়রায় সোপর্দ করেছে, সেই কারণে তার সম্পর্কে কোনও বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করতে পারবেন না। যতক্ষণ না ওর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ও নির্দোষ, আমার বা আপনাদের মতেই কলঙ্কস্পর্শশূন্য।'

কলঙ্কস্পর্শশূন্য। বেশ বলেছে সহদেব।

তাছাড়া আবার কি! আইন প্রত্যক্ষ ঘটনার কারবারী, অগোচর গহন মনের ধার ধারে না। মনের মাঝে পাপ নয়। যখন পাপ নয় তখন অপরাধও নয়।

'এখন প্রমাণ মানে কি? কাকে বলে প্রমাণিত হওয়া?' ফোরম্যানের দিকে আবার তাকাল সহদেব। 'প্রমাণ আর কিছুই নয়

শুধু একটা বিশ্বাসের মাত্রা। আপনারা বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক। সমস্ত বিষয়-ব্যাপার বিবেচনা করে আপনাদের সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে যদি আপনারা মনে করেন যে ঘটনাটা ঘটেছে বা অবস্থাধীনে ঘটা সম্ভব, তাহলেই প্রমাণিত হল। আর যদি এর বিপরীত মনে করেন, অর্থাৎ যদি মনে করেন যা বলা হয়েছে তা ঘটে নি বা ও-ভাবে ঘটা সম্ভব নয়, তাহলেই অপ্রমাণিত হল। এর মাঝামাঝি একটা অবস্থা আছে—'

সত্যি, কী প্রমাণ? হোটেলে একটা একক ঘর নিয়েছে। হ্যাঁ, নিজের নামেই নিয়েছে। সেটাই তো সারল্যের চেহারা। কেন নিয়েছে? বাড়িতে নিজের বৈঠকখানা করার মত বাড়তি ঘর নেই, তাই। এতে কার কী বলবার আছে? সময়ে অসময়ে অনেক লোক দেখা করতে আসতে পারে। তা তো পারেই। সে তো বাড়িতেও পারে। শুধু বাড়িতে কেন, হাটে মাঠে ঘাটে, সিনেমায়, স্টেশনে, শ্মশানে-মশানে—কোথায় নয়! ফালতু একটা ঘর রাখার জন্যে বড়জোর একটা সন্দেহ করতে পার। মনের ওই মাঝামাঝি অবস্থা, দোদুল্যমান অবস্থা—কিন্তু সন্দেহ তো কিছু প্রমাণ নয়—

'মাঝামাঝি অবস্থা মানে', বলতে লাগল সহদেব, এ-ও হয় ও-ও হয়—অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত সন্দেহের অবস্থা। একটা বিষয়ের যদি দুটো বিপরীত ব্যাখ্যা হতে পারে বোঝেন, তবে যেটা নির্দোষ ব্যাখ্যা সেটা গ্রহণ করবেন। তার মানে, আপনাদের মনে যদি একটা সঙ্গত সন্দেহের উদ্রেক হয়, বিশ্বাস করা কি না করা, তাহলে সেই সন্দেহের ফল আসামীকে দেবেন। অর্থাৎ সেই সন্দেহের ওজুহাতে খালাস দেবেন আসামীকে—'

হ্যাঁ, বড় জোর একটা সন্দেহ হবে। কী সন্দেহ? না, একজন ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে করে এই ঘরে নিয়ে এসেছিল সহদেব, এবং—

নিজের কর্তৃত্বে একটা আস্ত ঘর যখন, তখন বিরলে একা-একাই কাটাতে হবে এ ঘরে এমন কোনও অলিখিত আইন আছে নাকি? কোনও মহিলা এসে দুদণ্ড বসে গল্প করে যেতে পারবে না? শুধু

গল্প কেন, ইচ্ছে করলে স্নানও করতে পারে, লাগোয়া এমন পরিষ্কার বাথরুম। কত বাড়িতে বিকেলের দিকে দু ঘটি জল থাকে না চৌবাচ্চায়। হ্যাঁ, খেতেও পারে হোটেলের খানা। এতে অদ্ভুতের কী আছে?

ভদ্রমহিলা! লোকে প্রথমেই তাকাবে মাথার দিকে, সিঁথির দিকে। হ্যাঁ, সিঁদুরের স্পষ্ট আভাস আছে। কালীঘাট থেকে টাটকা লাগিয়ে আসা নয়, বেশ ঘষা-ঘষা বাসি সিঁদুর। তারপর তাকাবে পায়ের দিকে। হ্যাঁ, জুতো, স্ট্র্যাপওয়ালা স্যাণ্ডেল দেখবে পায়ে। আর কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ বা থলে কেন না থাকবে!

কেন, স্ত্রী—স্ত্রী নয় কেন?

স্ত্রী কি বাড়ির বাইরে রাত কাটাতে পারে না নিজেরই আরেক রকম ঘরে? নতুন রকম পরিবেশে? বাড়ির রান্নাঘরের বাইরে তার কি কোথাও খাওয়া বারণ?

'এখন প্রমাণ করবার ভার কার?' আবার বলতে লাগল সহদেব। 'প্রমাণ করার ভার সরকার পক্ষের। আসামীকে কিছু বলতে হবে না, কোনও সাফাই দেবার তার প্রয়োজন নেই। যদি সে কিছু বলেও আত্মপক্ষে এবং সে কৈফিয়ত যদি বিশ্বাস না করেন, যদি তা মিথ্যেও হয়, তবু সেই কারণে তাকে দোষী বলতে পারবেন না। আসামী কী বলল না বলল তার উপরে বিচার হবে না। তার বক্তব্যটা মনে রেখে আপনারা সরকার পক্ষের সাক্ষ্যবাক্য যাচাই করবেন। সরকার পক্ষকে স্বাধীন ও সম্পূর্ণ সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে আনীত অভিযোগ আপনাদের সামনে নিঃসন্দেহরূপে বিশ্বাস্য বলে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে—'

কী কৈফিয়ত দেবে সহদেব, যদি ধর—অসম্ভবই ধর—তার বিরুদ্ধে নালিশ হয়, সে অমনি দাঁড়ায় এসে দায়রায়? নট্ গিল্‌টি বলেই সে চুপ করে থাকবে নিশ্চয়, কিন্তু জেরায় তার উকিলকে ইঙ্গিত করতে হবে কেন এই মিথ্যে অভিযোগ। ইঙ্গিত তো মুখস্থই আছে। ও জাতীয় মামলায় যা মামুলি ইঙ্গিত—ব্ল্যাকমেল। সতীত্বের কালোবাজার।

না, এর চেয়েও গূঢ়, দৃঢ় ইঙ্গিত আছে।

অণিমার স্বামী শশধর মফস্বলী কোর্টের আমলা। সহদেব যখন আগে সেখানে ছিল, সেই চৌকিতে, তখন তার অধীনে কাজ করেছে শশধর। এখন যখন সহদেব সদরে উচ্চমঞ্চে সমাসীন, তখন শশধর বায়না ধরেছে সহদেবের তাঁবে, সদরেই তাকে একটা সরস জমি দেওয়া হোক, যেখানে বৃষ্টি অঝোর আর ফসল অঢেল। অল্প কথায়, যেখানে খুব—খুব পয়সা।

ততদিনে অ্যাপয়েন্টমেণ্টের অর্ডার দিয়ে দিয়েছে সহদেব এবং বলতে পেরেছে অকুণ্ঠে যে মনোনীত পোস্টিং পায় নি বলেই শশধরের আক্রোশ। আর কী করবে, হাতের কব্জার মধ্যে স্ত্রী আছে তাকে দিয়ে সাজিয়েছে মামলা।

কু ভাবতে শুরু করলে কতদূর পর্যন্ত চলে আসে লোক। মনে মনে এরই মধ্যে হাসল সহদেব।

এ মামলায়, মানে বিচারাধীন মামলায়, প্রধান অভিযোক্ত্রী সাবিত্রী—নির্যাতিতা মেয়ে, যাকে বলে ভিকটিম গার্ল।

সহদেবের বিরুদ্ধে যদি মামলা হয়, তবে সাক্ষ্য দেবে অণিমা? দাঁড়াবে এসে কাঠগড়ায়? বলবে, জজসাহেব আমাকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছিলেন হোটেলে?

তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন? জিগগেস করবে উকিল।

দিয়েছিলেন।

পারবে বলতে?

গাঁজাখোরের দিবা-স্বপ্নও বুঝি এতদূর যায় না।

'প্রমাণের কোনও পরিমাণ নেই।' জুরিবাবুদের উদ্দেশ করে আবার বলতে লাগল সহদেব। 'এমন কোনও বিধান নেই যে অমুক ধরনের মামলায় অতসংখ্যক সাক্ষী লাগবে। আপনারা একজন সাক্ষীকে বিশ্বাস করেও ঘটনা সত্য বলতে পারেন, আবার হাজার সাক্ষী এসে বলে গেলেও বলতে পারেন, অবিশ্বাস্য।'

হ্যাঁ, একজনই শুধু সাক্ষী হতে পারে তার মামলায়।

শশধর কী জানে? বিন্দুবিসর্গও জানে না। বড়জোর বলতে পারবে, সহদেব যখন সেই চৌকিতে হাকিম ছিল তখন অণিমা প্রায়ই যেত সহদেবের স্ত্রী লীলার কাছে। কি একটা সম্পর্ক বের করে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল লীলার সঙ্গে। এর বেশি আর সে কী জানে? সে কি জানে যখন লালা বাড়িতে অনুপস্থিত, তখনও আসত অণিমা? লীলাদি কী অপূর্ব পান সাজে এই বলে সহদেবের ডিবে থেকে নিয়ে যেত মিষ্টি খিলি? ঠোঁট দাঁত জিভ রাঙাত?

শশধর যদি কিছু বলে বানিয়ে বলবে। অণিমার জবানবন্দির সঙ্গে মিল রেখে বলবে। তার নিজের কোন কাহিনী নেই। সে হবে শুধু বেহালার দ্বিতীয় তার।

সাক্ষী বলতে ওই একজনই। অণিমা। অদ্বিতীয়া।

ছলে-বলের কথা একটা কিছু বলতে হবে তো! নইলে তার নিজের নির্দোষিতা সাব্যস্ত হয় কি করে? যদি বলে আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি তা হলে সমাজের চোখে সে কি করে নিষ্পাপ থাকে? সহদেবের অবিশ্যি ওতেও ছাড় নেই, অ্যাবডাকশন না হলেও অ্যাডাল-টারিতে পড়বে। ৩৬৬ নয় তো ৪৯৭।

তাই ছল-বল ভাবতে হবে। বল চলবে না—ও একটা এমন প্রকাণ্ড বড়ি যে যাবে না গলা দিয়ে। তাই ছলই খুঁজতে হবে।

এ মামলা, বর্তমান বিচারাধীন মামলাও ছলের মামলা।

'এখন সরকার পক্ষের কেস কী?' জুরিবাবুদের আবার লক্ষ্য করল সহদেব। 'সাবিত্রী তার মা আর বাবার সঙ্গে থাকে তাদের বাড়িতে। সাবিত্রীর বিয়ে হয় নি, সেলাইয়ের ইস্কুলে কাজ করে, বয়েস, সরকার পক্ষেরই স্বীকার, আঠারোর উপরে। আসামী কালাচাঁদ সাবিত্রীর বাপের আফিসে কাজ করে, থাকে পাশের কলোনিতে। ঘটনার দিন তুপুরবেলা কালাচাঁদ সাবিত্রীদের বাড়িতে এসে বলে, হঠাৎ আপিসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে হরিচরণ, হাসপাতালে

নিয়ে গেছে, যদি দেখতে চাও তো চল। মাকে জানতে দিতে চাইল না কালাচাঁদ, যেহেতু মা-র মর-মর অসুখ, আর ক্ষণিক উপশমে এখন আছে ঘুমিয়ে। ওকে জাগিয়ে একথা বলতে গেলে বাড়িতেই একটা মহামারী হয়ে যাবে। চল দেখে আসি। যদি জ্ঞান হয় নিয়ে আসি বাড়িতে, নয়তো হাসপাতালে সেবা-চিকিৎসার পাকাপাকি ব্যবস্থা করি। যা সাধ্য টাকাকড়ি নিয়ে চল সঙ্গে করে। এই ভাবে ভুজুং দিয়ে সাবিত্রীকে ট্যাক্সি করে বার করে নিয়ে যায় কালাচাঁদ। কোথায় হাসপাতাল! সুস্থ সমর্থ হরিচরণ ঘরে ফিরে এসে দেখে মেয়ে নেই, থানায় গিয়ে প্রথম এত্তেলা দেয়। তিন দিন পরে সাবিত্রীকে পায় কালাচাঁদের সঙ্গে, আরেক বস্তিতে, শহরতলিতে। ডাক্তারি পরীক্ষায় পাওয়া যায় এই হরণের উদ্দেশ্য কী ছিল?

'আসামী কালাচাঁদ নিজেকে নির্দোষ বলছে। এর বেশি তার কোনও রা-শব্দ নেই। কিন্তু জেরায় তার উকিল এই ইঙ্গিত করতে চেয়েছে যে, সাবিত্রী স্বেচ্ছায় বেরিয়েছে কালাচাঁদের সঙ্গে, কোনও ছল-বলের বশবর্তী হয়ে নয়। যদি সাবিত্রী নিজের ইচ্ছেয় কালাচাঁদের সঙ্গে বেরোয়, সে সাবালিকা মেয়ে, ডাক্তারি পরীক্ষার ফল সত্ত্বেও কালাচাঁদ নির্দোষ—

'এখন সাক্ষ্য প্রমাণে আসুন।'

হ্যাঁ, আসুন। কী বলবে অণিমা। কোন ছলনার বুনন তুলবে?

মফস্বলী শহর, মানে চৌকি থেকে আসবে তো প্রথম সে তার বোনের বাড়ি। সেখানে সন্ধ্যের সময় নিজের গাড়িতে হাজির হবে সহদেব। নইলে কোথায় কি সুধা-হোটেল, ও তার জানবে কী! ঠিকানা পাবে কোথায়? ঠিকানা পেয়েই বা যাবে কি করে একা-একা? গেঁয়ো মেয়ে এলোধাবাড়ি শহরের দিশপাশ পাবে না। ও শুধু প্রস্তুত হয়ে থাকবে, সহদেব হর্ন দিলেই আসবে বেরিয়ে। সটান এসে উঠবে হোটেলে।

কা বলবে ? বলবে, সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। সিনেমা দেখাবার নাম করে এনে তুললেন এক হোটেলে।

হোটেলের দোতলার ঘরে ? জিগগেস করবে উকিল।

হ্যাঁ।

সিঁড়ি ভেঙে উঠেছিলেন ? পিঠ-পিঠ আবার প্রশ্ন।

হ্যাঁ।

ক ধাপ সিঁড়ি ?

গুনি নি। অনেক। না বলে পারবে না অণিমা।

হ্যাঁ, অনেক। সায় দেবে উকিল। তারপর ছুঁড়বে মোক্ষম প্রশ্ন : চেঁচিয়েছিলেন একবার ? কাউকে বলেছিলেন হাঁকডাক করে ?

না। চোখ নামাবে অণিমা।

নয়তো চুপ করে থাকবে। হোটেলটাকেই সিনেমা-হল মনে করেছিল এ বলতে সাহসে কুলোবে না। তখন আবার আরেক রকম জেরায় জেরবার হয়ে যাবে।

সুতরাং চলবে না ছলের ওজুহাত।

কিংবা এ কি বলবে, হোটেলে খাওয়াবার নাম করে নিয়ে এসেছিল ?

তোমারই বা খাবার এত প্রয়োজন কী ? ঘরের বউ তুমি, হলই বা না পুরনো স্টেশনের জানাশোনা, তাই বলে বাজে-আত্মীয় দুর-পুরুষের সঙ্গে তুমি চলে আসবে একা একা ? কী তোমার এমন নোলার শকশক। বলি, ঝাল পেঁয়াজ খাও নি কোনও দিন ? উকিলের যা জিভ, বিছুটির বেত পড়বে সর্বাঙ্গে।

সুতরাং ছলের গল্প করো না।

হ্যাঁ, তুমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছ, নিজের স্নায়ুশিরার বশবর্তী হয়ে। আর, যদি নিজের ইচ্ছায় এসে থাক, অ্যাবডাকশন বা ফুসলানো নেই। দেয়ার ইজ অ্যান এণ্ড অফ দি প্রসিকিউশন কেস।

হ্যাঁ, খতম। তোমার আবার ডাক্তারি পরীক্ষা কী! হলই বা না ডাক্তারি পরীক্ষা—ভুলে যাচ্ছ কেন, তোমার স্বামী আছে।

আর, অণিমার শুধু অসমর্থিত একক সাক্ষ্য—

এবার জুরিকে আইন বোঝাচ্ছে সহদেব। বোঝাতে-বোঝাতে থামল। থেমে আবার শুরু করল: 'এখন একমাত্র ভিকটিম-গাল বা নির্যাতিতা মেয়ের একক সাক্ষ্যের কী মূল্য আপনারা দেবেন তার নির্দেশ নিন। অভিযোক্ত্রী মেয়ের একক সাক্ষ্য খুব সতর্ক হয়ে বিবেচনা করবেন। আপনারা যদি নিঃসন্দেহরূপে বিশ্বাস করেন, তবে ওই একক সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই আপনারা আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন। আইনে আপনাদের সে এক্তিয়ার আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটা মনে রাখবেন, আমি আইনের বলেই আপনাদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, ওই একক সাক্ষ্য সম্বল করে দোষী বলা নিরাপদ নয়। বরং বলে দিচ্ছি, বিপজ্জনক। দোষী সিদ্ধান্ত করার আগে আপনারা ওই অভিযোক্ত্রী মেয়ের সাক্ষ্যের সপক্ষে সমর্থক সাক্ষ্য খুঁজবেন। সমর্থক সাক্ষ্য ছাড়া একক সাক্ষ্য অগ্রাহ্য না হলেও দুর্বল।

'এ মামলায় কী সমর্থক সাক্ষ্য? প্রথমে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা ভাবুন। বাপ হাসপাতালে আছে এ খবর পেয়ে মেয়ে মাকে জাগাবে না? মাকে না জাগাক, প্রতিবেশী কাউকে বলবে না! সম্ভাব্যতাই যদি অসমর্থনে যায় তাহলে মামলাই টেঁসে গেল। তারপর, ওদের পাড়ার নরহরি দেখেছে ওদের দুজনকে, কালাচাঁদ আর সাবিত্রীকে, এক ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে যেতে; আর মোহনতলার বস্তির রামকেলি আর শিওদেও দেখেছে সাবিত্রীকে ঘরের মধ্যে বন্দী, যে-ঘরে কালাচাঁদের ওঠাবসা। তিন-চারদিন সেখানে একটানা থেকেছে, সাবিত্রী কান্নাকাটা করে নি, অচরিত কিছু হয়েছে বলে নালিশ করে নি কাউকে। হৈ-হল্লার টুঁ-টি শোনে নি কেউ। বলছে, ছোরা উঁচিয়ে দাবিয়ে রেখেছিল কালাচাঁদ, কিন্তু এ কি নেবে আপনাদের মন?

আরও বলছে, সব কালাচাঁদের কারসাজি, তার উদ্দেশ্য জলজ্যান্ত অসৎ, আর তা যে অসৎ তা তার ব্যবহারেই সপ্রমাণ। আর ব্যবহারের সমর্থক প্রমাণ ডাক্তারি রিপোর্ট।

'এখন সাবিত্রীকে আপনারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন কিনা আপনারা জানেন। অভিযোক্ত্রী মেয়ের একক সাক্ষ্যের কতটুকু কী ওজন তা বলেছি আপনাদের কাছে। মোদ্দা কথা, যদি একবার আপনাদের এ ধারণা হয় সাবিত্রী স্বয়ংবরা হয়েছে, প্রেমের পথে পা বাড়িয়েছে, হোক যত সে পিচ্ছিল পথ, আপনারা এক বাক্যে কালাচাঁদকে ছেড়ে দেবেন। কিন্তু যদি বোঝেন—'

তার মামলায় সমর্থক সাক্ষী একমাত্র হোটেলের ম্যানেজার। বড়জোর বলবে, একজন সধবা মেয়েছেলে, হ্যাঁ, ধরে নিচ্ছি অণিমাকেই সে সনাক্ত করবে, অণিমাকেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তার হোটেলের ঘরে, যে ঘর কদিন আগে থেকে ভাড়া করা। আরও হয়তো বলবে, পুলিসের উস্কানিতে, যে, সে দেখেছে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করেছে সহদেব।

বলুক। কী হয় তাতে?

বিকল্প সাফাই নিতে পারে আসামী। হ্যাঁ, স্বীকারই না হয় করা গেল তর্কের ক্ষেত্রে যে অণিমা এসেছিল তার ঘরে। হ্যাঁ, বন্ধ হয়েছিল দরজা। কল্পনা যতদূর স্পর্ধিত করা যায় করা হোক। কী হবে তাতে? কী আসে যায়? যদি অণিমা স্বেচ্ছায় এসে থাকে? সজ্ঞানে?

হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে অ্যাডাল্টারি হতে পারে। সেক্ষেত্রে অভিযোক্তা হবে শশধর, অণিমা নয়। সেখানে সিংহাসনচ্যুত অধিকারভ্রষ্ট স্বামীই ফরিয়াদী। তার মুকুটের মণি ম্লান করে দিয়েছে দস্যু। মণি কিন্তু অপরাধী নয় আইনের চোখে। অ্যাবেটর বা প্ররোচক হিসেবেও নয়।

কিন্তু কী বলবে শশধর? সে কী জানে? কী দেখেছে সে?

সে কিছু জানে না, কিছু দেখে নি। ঘরের এমন কোনও জানলা নেই যে সে উঁকি মেরে দেখতে পারে বাইরে থেকে।

ওভার্ট অ্যাক্ট বা প্রকাশ্য ঘটনার সাক্ষ্য কী? প্রায় দু বছর ধরে সহদেব এই সদরে, আর শশধর সপরিবারে সেই মফস্বলে, যদিও মফস্বলটা বাস্‌-এ দেড়-দুঘণ্টার পথ। কয়েক মাস আগে ইনস্পেকশনে গিয়েছিল বটে সহদেব, আর শশধর একদিন তার বাড়িতে চা খেতে ডেকেছিল, আর সেই উপলক্ষ্যে অণিমার ঢেউটা সরল সীমা পেরিয়ে ছুঁয়েছিল সহদেবকে, সেই পুরনো সঙ্কেতলাস্যের ঢেউ, সেই ছুটে চলার বা থমকে দাঁড়িয়ে থাকার—আর, আসল ঢেউ তো চোখে, ইচ্ছে করলে চোখ যা বলতে পারে এক রাজ্যের কথা দিয়ে তা বোঝানো যায় না—আর, এক চাউনিতেই ঈশ্বর আছে কি নেই, সাম্রাজ্যের উত্থান না পতন, এক মাঠ চোরকাঁটা না এক আকাশ নক্ষত্র।

তা তোমার কেস তো মফস্বলের ঘটনা নয়, এখানে, সদরে, সুধা-হোটেলে, দোতলায়। সুধা-হোটেলের তুমি জানো কী! কচু—কাঁচকলা! কোন তলায় কটা কামরা, দোতলার সেই চিহ্নিত কামরাটার অবস্থান কী, কী তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, তোমাকে শিখিয়ে না দিলে তুমি কুপোকাত। তুমি কী দেখতে পার? কোন ফাঁক দিয়ে? দেওয়ালে কি গর্ত থাকবে, লখিন্দরের লোহার ঘরে সাপ ঢোকাবার মত তোমার সন্দেহ ঢোকাবার রাস্তা?

তোমার সাক্ষ্য অকর্মণ্য। ফৌজদারিতে দেহ চাই, সন্দেহে কিছু হবে না।

ওই এক ম্যানেজার। সহদেবের কাছ থেকে টাকা যদি সে না-ও খায়, কী বলবে, কতদূর বলবে? বলবে, দরজা বন্ধ করেছিল।

দরজা ভেজিয়ে রেখেছিল এও তো হতে পারে? নির্ঘাত জেরা করবে উকিল।

তা পারে।

আপনি খিল লাগাবার শব্দ শুনেছেন?

না, তা শুনি নি।

আপনি দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখেছেন যে বন্ধ?

না, তা দেখি নি।

বাইরে থেকে হাঁকডাক করে দেখেছেন যে তখুনি পান নি সরল সাড়া ?

না, তা ডাকি নি।

কী হয় ? ধরুন যদি কোনও পরিচিত ভদ্রমহিলা মফস্বল থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আপনার ঘরে আসে আর বাইরের লোকের চোখ না পড়ে সেই গ্রাম্য লজ্জায় যদি সে দরজাটা ভেজিয়ে দেয় তা হলেই আপনার বিরুদ্ধে অন্যায় অনুমান করতে হবে ?

কখনও না। প্রবল শক্তিতে ঘাড় ঝাড়া দিয়ে হুঙ্কার করে উঠবে ম্যানেজার।

টিকবে না মামলা। অ্যাডালটারির চার্জও ফেঁসে যাবে।

ফৌজদারির দণ্ডবিধিতে কোনও অপরাধই প্রমাণিত হবে না। কোনও করণে-প্রকরণেই পড়বে না সহদেব। একটা না একটা কম পড়ে যাবে। সবগুলি উপাদানের নির্ভুল সমাবেশ হলেই না প্রমাণ ! এমনভাবে দক্ষ কারুকার্য করেছে, প্রমাণের তলোয়ার খাপের মধ্যে ঢুকলেও হাতল পর্যন্ত নামবে না। কাপে-কাপ হবে না। এক চুল কম পড়ে গেলেই গোটা দেহটা বাদ পড়ে যাবে।

অপরাধ না হোক, পাপ হবে তো ? কে যেন সত্ত্বার শিকড় ধরে আমূল নাড়া দিল।

হ্যাঁ, পাপ হয়তো হবে। কিন্তু পাপ কী সুন্দর কী উজ্জ্বল কী মধুর !

পাপ না থাকলে কে বাঁচত শুধু এই পুণ্যবানের কোট-গাউন পরে, গলায় টুঁটি-টেপা কলার এঁটে !

আর, যাই বল, তাকেই তো মানায় এই পাপ। যে সমাজের শীর্ষের লোক, যে একজন প্রধান রাজপুরুষ, যে বুক ফুলিয়ে চলে বিদ্যুৎবেগে, রাস্তার মাঝখান দিয়ে, অন্যের মন্থর গাড়ি কাটিয়ে, যাকে আঙুল দিয়ে দেখায় পরস্পর, যাকে পেলে প্রথম লাইনের চেয়ার

পড়ে—তাকেই তো মানায় এই সম্পদ। এ তার বুকের কৌস্তুভ, মাথার শিখীপুচ্ছ, গলার বনমালা।

এ পাপ যাকে-তাকে মানায় না।

যে সাহসী, যে অবস্থাকে সাজাবার নৈপুণ্য জানে, যে শিল্পী, যে স্রষ্টা, যে সম্বলসবল তাকেই এ শোভা পায়।

তেমন একটা গরিমা না থাকলে আকৃষ্টই হত না সহদেব। নইলে এমনিতেই কি, ডাল-ভাতের চেয়েও মুখস্থ, পথের পাশে একটা রেস্টুর‍্যান্টে হঠাৎ চা-খাওয়ার মত—শুধু একটা নিষেধ আছে বলেই এর এত মূল্য। একটা সর্বস্বহানির বিপদ আছে বলেই এর মাহাত্ম্য। হ্যাঁ, সর্বস্বহানি—সুনামই তো সর্বস্ব। সেই নিষেধ, সেই বিপদ যেমন আছে বরফ ঢাকা হিমালয়ের চূড়ায়, ঝড়তোলা সমুদ্রের গভীরে। তাই বলতে পার পাহাড়ে-সমুদ্রে যাচ্ছি। তাই বলতে পার যাচ্ছি দুরূহের সাধনায়। পাপ সহজ হয়েও দুরূহ।

'এখন আপনারা যান।' জুরিদের বললে সহদেব। 'নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্তে আসুন, আসামী দোষী না নির্দোষ এবং ফোরম্যানের মারফত জানান আমাকে সেই ভার্ডিক্ট। আপনাদের একমত হতে হবে এমন কোনও কথা নেই, তবু আশা করি এক্ষেত্রে আপনাদের একমত হতে কোনও বাধা হবে না। আবার আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, সন্দেহের অতীতরূপে সুদৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হতে পারলেই আসামীর অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে বলে ধরবেন—নচেৎ—'

চার্জ দেওয়া হয়েছে বারোটায়, কিন্তু এখন আড়াইটে বাজে, জুরির ফেরবার নাম নেই।

'কখন ঢুকেছে ঘরে?' আর্দালিকে জিগগেস করল সহদেব।

'এই প্রায় দেড়টায়।' আর্দালি হতাশের মত মুখ করলে।

'সে কি! ঘর খালি ছিল না বুঝি?'

'না। অন্য কোর্টের জুরিতে ভরা ছিল। তারা বেরিয়ে আসতেই ঢুকিয়ে দিয়েছি।'

'এতক্ষণ তবে কী করছিল জুরিবাবুরা ?'

'চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিল।'

তারই জন্যে সকালের দিকে চার্জ রাখে সহদেব। যাতে সমস্ত বাধা-অসুবিধে পার হয়ে বিকেল-বিকেল, যথা সময়ে, বেরিয়ে পড়তে পারে কোর্ট থেকে। আজ তো আগে বেরুনোর বিশেষ একটু তাড়া। বাড়ি গিয়ে পোশাক বদলিয়ে যেতে হবে প্রথমে অণিমার বোনের বাড়ি। কী একটা বিতিকিচ্ছি ঠিকানা দিয়েছে, বাড়িটা চিনতে না আবার দেরি হয়। সেখান থেকে অণিমাকে তুলে নিতে হবে গাড়িতে। তারপর মাখনের মধ্যে যেমন ছুরি যায়, নিয়ে আসতে হবে হোটেলে।

ড্রাইভার থাকবে ? বা, ড্রাইভার থাকবে বইকি। ড্রাইভার ঝাপসা-ঝাপসা সন্দেহ করবে অথচ স্তব্ধ থাকবে, কোনও দেওয়ালের কানেই বিন্দুবিসর্গ ফিসফিস করবে না, বাইরে-বাইরে বরং এমন একটা ভাব দেখাবে এও যেন কোর্টেরই কাজ—এটার মধ্যেও একটা সম্ভোগ আছে।

জুরিরা না হয় আড্ডা দিচ্ছে, এখন সহদেব করে কী ? আরেক পেয়ালা চা আনতে বলল আর্দালিকে।

বসে বসে চা খাই আর পাপের কথা ভাবি।

পাপের কথা মানেই অণিমার কথা।

না, আইনের চোখে যখন অণিমা অপরাধী নয় তাকে পাপী বলা সাজে না।

সেই প্রথম দেখা হয়েছিল মফস্বল চৌকিতে প্রায় নয়-দশ বছর আগে। কী সম্পর্ক ? না, লীলার খুড়তুতো বউদির বোনঝি। লীলাই নিয়ে এসেছিল ঘরে কিন্তু কিছু বলবার আগে মেয়েটাই ঢলা-ঢলা গলায় বললে, 'জানেন আপনার ইনি আমার মাসি হন।'

'রক্ষে কর। সেই সুবাদে আমাকে যেন মেসো বোল না।' সহদেব রসিকতা করল।

মেয়েটা বয়সে হালকা, তা ছাড়া সম্পর্ক ছোট করে নিয়েছে—তুমি বলে ফেলল সহদেব।

'কেন, মেসো মন্দ কি?'

'না, কেমন ফেঁসো-ফেঁসো শোনায়।'

'ফেঁসো মানে কি?' চোখে ঝিলিক দিল অণিমা। 'যে সব ফাঁস করে দেয়, না, গলায় যে ফাঁসি পরায়?'

'ফেঁসো মানে, তুলোর ফেঁসো, দড়ির ফেঁসো, মানে অসার বস্তু।'

সে যে কী অপূর্ব, অপার্থিব চোখে তাকাল অণিমা, বিধাতা ছাড়া কোনও চিত্রকরের বুঝি সাধ্য ছিল না এঁকে দেখায়। তখন লীলা কি ছিল না সেখানে দাঁড়িয়ে? সংসারের ডাক পড়েছিল অন্যত্র?

অণিমা কটাক্ষভরা চোখে বললে, 'কেন, এসো-এসোও তো হতে পারে?'

একটা চাউনিতেই সব। এক শতাব্দীর ইতিহাস।

গেঁয়ো চৌকিতে একক হাকিম—কর্তৃত্ব সব এক হাতে। তাহলে বোঝ, আমরা যখন আত্মীয়, আমাদের হাতও লাগামের উপর—বলে বেড়াতে লাগল শশধর। সুতরাং আমার হাত তৈলাক্ত কর যদি রথের চাকা ঘোরাতে চাও। শশধর ফুলতে লাগল।

কিন্তু কেউ কি কখনও বলে, ঢের ফুলেছি, আর ফুলব না? আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে পারলে অশ্বত্থগাছ হতেই বা দোষ কি!

সেদিন একা ঘরে অণিমা এসে বললে, 'আমার দিকে তাকান।'

'তোমার দিকে?' চোখ বড় করল সহদেব।

'কেন, আমার দিকে কি তাকান যায় না?' দুই চিকন ঠোঁটের উপর দিয়ে জিভের লাল ডগাটুকু বুলিয়ে নিল অণিমা।

'না যায় বইকি, খুব যায়।' একটু ঘন করেই তাকাল সহদেব। বেশবাসের শৈথিল্যটা যে যত্নকৃত বিন্যাস বুঝতে দেরি হল না।

'আমার কথাটা এখানে কিন্তু গৌরবে একবচন।'

'গৌরবে একবচনও হয় নাকি?'

'নিশ্চয়ই হয়। আমার দিকে তাকান মানে আমাদের দিকে তাকান।' হাসল অণিমা।

'তোমাদের দিকে ?'

'হ্যাঁ, আমার আর আমার স্বামীর দিকে।' অণিমার গলার স্বর করুণ হয়ে এল : 'আমাদের অনটনের দিকে।'

ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হল সহজেই। আদালতে একটা ভিজে সেরেস্তা খালি হয়েছে, সেইটে যেন শশধরকে দেওয়া হয়। প্রকাণ্ড সংসার, নাবালক কতগুলি ভাই-বোন তার কাঁধে-পিঠে। আর যা দুর্মূল্যের বাজার। এর মুণ্ডু ওর ঘাড়ে করে আর চলছে না—

কিন্তু ভিজে ?

হ্যাঁ, দুধেতে-মধুতে ভিজে।

সাহস করে বললে সহদেব—এ সাহসের পটভূমি অণিমাই তৈরি করেছে, অশালীন হওয়ার মধ্যেও সাহস চাই—'তোমাকে তো দিলাম কিন্তু আমি পাব কী ?'

কথা কইল না অণিমা। নিজের ডান হাতখানি সহদেবের ডান হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে দিল।

শিথিল, অসতর্ক বাঁ হাত নয়, সক্রিয় স্বাধীন সমর্থ ডান হাত—নিটোল স্পর্শে আত্মস্থ হবার আগেই পালিয়ে গেল অণিমা।

বলা বাহুল্য শশধরকে দেওয়া হল সেই সিক্ত সেরেস্তা। খুঁটিতে বাঁধা থাকলেও গরু যেমন এদিক-ওদিক গলা বাড়িয়ে ঘাস খায় তেমনি চাকরির খুঁটি ধরে শশধরও ঘুষ খেতে লাগল।

আর সহদেব ?

সহদেব অণিমার আঁচল ধরে চলে এল এক বন্ধুর পার্বত্যদেশে বেড়াতে। এক ভয়ের দেশ, আনন্দের দেশ। রাত নেই কিন্তু কুয়াশায় ঢাকা। বিস্ময়ের রৌদ্রকে ঢেকে রহস্যের কুয়াশা। চড়াই-উতরাই অনেক করল কিন্তু পেল না গুহার আশ্রয়, নির্ভয় নিভৃতি। নদীর পারে এসে দাঁড়াল, নির্জনতার নদী, জল তুলে তুলে চোখেমুখে

ছিটোলো, ধুলো হাত-পা, কিন্তু অবগাহন স্নান হল না কোনওদিন। অবতরণের ঘাট পেল না কোথাও।

একটা উল্কা উদ্যত হয়ে আছে, মহাশূন্য পেরিয়ে পড়তে পেল না মাটিতে। মহাশূন্যেই ঘুরতে লাগল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, তিনটে। সহদেব ডাকল আর্দালিকে। প্রায় ধমকে উঠল তার উপর: 'কি রে, হল? বেরুলো লোকগুলো?'

'না, হুজুর।'

'পেস্কারবাবুকে ডাক।'

এল পেস্কার। সহদেব জিগ্‌গেস করলে, 'কী ব্যাপার? এত কী জটিল মামলা! করছে কী এতক্ষণ?'

'কী আর করবে! গল্পগুজব চালাচ্ছে বসে বসে।' বললে পেস্কার।

'গল্পগুজব?'

'নয়তো বিল তৈরি করছে।'

উপায় কী?

কিছু উপায় নেই। দরজায় ধাক্কা দিতে পার না। জানলার খড়খড়ি তুলে তাকাতে পার না ভিতরে। বাইরে থেকে জিগগেসও করতে পার না, মশাইদের হল? গভীর গবেষণায় নিমগ্ন, তাদের ত্রস্ত-ব্যস্ত করতে পার না কিছুতেই। কথাবার্তা দূরের কথা, তুচ্ছ শব্দসঙ্কেতও তুলতে পার না। তুললেই সব ভেস্তে যাবে। ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

ইজিচেয়ারে শুল সহদেব। সিগারেট ধরাল। ভাবতে লাগল সেই উল্কার কথা। মহাশূন্যে যে ঘুরছে এখনও। এখনও যে নামে নি সমতলে।

হঠাৎ বদলির অর্ডার হল সহদেবের। বদলি মানে প্রমোশান।

দরজার কাছে আধখানা হয়ে দাঁড়িয়ে অণিমা বললে, 'চলে যাবেন?'

দার্শনিক ঔদাসীন্যে সহদেব বললে, 'চলে যাবার জন্যেই তো আসা। ভুলে যাবার জন্যেই তো ভালোবাসা।'

'ককখনো না।' দরজার উপর গাল পেতে অণিমা বললে, 'ককখনো ভুলব না আমি। তা ছাড়া আমি জানি আবার আমাদের দেখা হবে।'

'দেখা হবে ?'

'আপনি জজ হয়ে আসবেন এ জেলায়—'

'তখন তো আমি বুড়ো গো—'

'বুড়ো ?' কালো চোখের বিদ্যুৎকে স্থির রেখে অণিমা বললে, 'হাড়মাংসই বুড়ো হয় কিন্তু আকাঙ্ক্ষা বুড়ো হয় না।'

'হয় না বুঝি ?'

'না।'

'আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকলে যৌবনও জেগে আছে।' বিদ্যুৎটিকে ঢাকল গাম্ভীর্যের মেঘ দিয়ে।

সহদেব তাকাল ঘড়ির দিকে। এ কি, চারটে হতে চলল যে। মাথায় বাড়ি মারার মত কলিং-বেলে থাবা মারল।

'ডাক পেস্কারকে।'

পেস্কার এলেই বা কী এগোবে ? সহদেব ঝাঁজালো গলায় বললে, 'লোকগুলো কি হাওয়া হয়ে গেল নাকি ?'

'তা যাবে না।' বললে পেস্কার। 'বাইরে পাহারা আছে।'

'তবে কী অত ঘষামাজা করছে ?'

'ওই যে একমত হতে বলেছেন—' পেস্কার মাথা চুলকুলো।

'বা, একমত হতে না পারিস, মেজরিটি ভার্ডিক্ট দে। তাও তো বলেছি।'

'ওদেরকে বলা আর না-বলা !' পেস্কার শূন্যের মত মুখ করল। 'শিবে ওদের খোঁজ নেই, ওদের শুধু গাজনের ঘটা।'

হ্যাঁ, একমত হওয়া চাই। জুরির বেলায় যাই হোক, জারিজুরির বেলায় নিশ্চয়।

এত দিন কোনও আর যোগাযোগ ছিল না, এ জেলায় জজ হয়ে আসবার পর চিঠি লিখল অণিমা : 'কি, বলি নি? বলি নি জজ হয়ে আসবেন, আর আমাদের দেখা হবে?'

'শুধু দেখা?' পালটা চিঠি লিখল সহদেব।

বাঘের দেখা, সাপের লেখা। নিজে লিখে নিজেই আবার ব্যাখ্যা করল অণিমা। বাঘ মানে সহদেব আর সাপ মানে বামপন্থী বিধাতা। অদৃষ্টে দুর্ভাগ্য লেখা থাকলেই তবে ধরা পড়ে মারা পড়বে কিন্তু বাঘের থেকে তার কিছুতেই নিস্তার নেই।

আফিসে খবর নিয়ে জানল অনেক দিন ও-অঞ্চলে ইনস্পেকশন হয় নি। 'লিখুন মুন্সেফকে, ইনস্পেকশনে যাব।'

লীলা সঙ্গে যেতে চায়। সে সব দিন আর নেই, ইংরেজের দিন—ভাগ্যিস নেই, মনে-মনে আবার আশ্বস্ত হল সহদেব।

কোথাও পার্টি নেবে না, চা খাবে না, সদম্ভে বলে বেড়াতে লাগল সহদেব।

'কিন্তু আমার কথা আলাদা।' সন্ধ্যায় একেবারে ডাকবাংলোয় এসে পৌঁছুল অণিমা। 'আমি তো আপনার আত্মীয়া। কি, তাই না?'

'তার চেয়েও বেশি।'

'তবে চলুন আমাদের বাড়ি।' কটাক্ষগর্ভ চোখ অণিমার।

'না, না, তোমাদের বাড়িতে নয়।' চারপাশে তাকিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। গলার স্বর গাঢ় করল সহদেব। বললে, 'এখানে।'

আতঙ্কে মুখ যেন কালো হয়ে গেল অণিমার। কণ্ঠস্বরে গাঢ়তার ঠিক প্রতিধ্বনি আনল। বললে, 'না, এখানে নয়।'

সুন্দর! নাই বা হল এখানে, নাই বা হল কোনদিন। অণিমা যে বুঝতে পেরেছে, প্রত্যাখ্যান করেও যে প্রত্যর্পণ করেছে তাইতেই সহদেব খুশি।

'বেশ, তবে শহরে, সদরে—কোন একদিন।' হালকা হয়ে বললে সহদেব।

'বা, আমি তাই তো বলতে এসেছিলাম।' অণিমাও তরল হল। 'আমাকে সদরে নিয়ে চলুন।'

সহদেব হাসল। বললে, 'এবারেও গৌরবে একবচন নাকি?'

'কোন ছুতোয় সদরে বদলি করুন না ওঁকে।' আশপাশ একটু দেখে নিয়ে অণিমা থমথমে গলায় বললে, 'তা হলেই তো হতে পারি কাছাকাছি।'

'বেশ তো, শশধরকে বোল না বদলির দরখাস্ত করতে। করবে?'

'দেখি।' এক পা এগিয়ে আরেক পা পেছুলো অণিমা। বললে, 'দরখাস্ত না করলেও কোনও 'চেইনে' ঢেলে এমনিই তো পারেন বদলি করতে।'

'তবু—'

'আচ্ছা।' চলে গেল অণিমা।

পরদিন সকালে এক দরখাস্ত নিয়ে হাজির শশধর। এখানে তার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, স্ত্রী বিশেষরকম রুগ্ন, বহু দিন আছে এক স্টেশনে—অনড় হয়ে কেউ এতদিন থাকে না, তাই বদলি চায় সদরে। তারপর মিনতি ঝরিয়ে বললে কানে-কানে, 'স্যার, যদি সেই হৃষ্টপুষ্ট শাঁসালো পোস্টটা —'

বুঝেছে সহদেব।

ভীষণ বিরক্ত হলেও ঝালটা হজম করে নিল সহদেব। কঠিন মুখে বললে, 'দেখি কতদূর কী করা যায়। আরও আছে অনেক উমেদার। তবে আত্মীয়কে দিলে লোকে কী বলবে?'

'আত্মীয় যদি যোগ্য হয় তবে আত্মীয়তার জন্যেই সে অযোগ্য হবে?' শশধরকে কেমন করুণ শোনাল।

'না না, তা নয়। আচ্ছা দেখি—'

দেখতে তো হবেই। নইলে অণিমা ঘনিমা হয় কি করে?

কিন্তু এবার আর ঠকতে রাজি নয় সহদেব। এবার আগে কড়ি পরে তেল। এবার আগে ফাঁসি পরে বিচার।

চিঠি লিখে-লিখে সব ঠিক করেছে দুজনে।

ঘড়িতে সাড়ে চারটে বেজে গেল।

আবার চঞ্চল হল সহদেব। পেস্কারকে ডাকল। ডেকেই বা হবে কী? পেস্কার কী করতে পারে?

পেস্কার বললে, 'একুইটেলের মামলা, এত কী ভাববার আছে?'

তাই দে না ছেড়ে, বাড়ি পালাই।

কিন্তু, সহদেবেরও একুইটেল হবে তো? ছলনার কেস একেবারে না হয় তো তা নয়। অণিমা বলবে, স্বামীকে, শশধরকে সদরে বদলি করবে বলে বলেছিল, স্ত্রীকে দেখতে চাই কেমন সে রুগ্ন। মেডিকেল সার্টিফিকেটে হবে না, স্বয়ং সশরীরে দেখা দিতে হবে। ড্রাইভার দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল গাড়ি। নিজে না এসে ড্রাইভার পাঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এই কেস করতে। ড্রাইভার পাঠিয়ে নেওয়াটা সহদেবেরই নেওয়া হবে! হবে, হবে, অ্যাবডাকশান বা ফুসলানোর কেসও হবে। অণিমার বেরিয়ে আসাটা যে সরল নিষ্পাপ, শুধু একটা ছলের কুয়াশার আড়ালে, এ কাহিনা তৈরি করা কঠিন হবে না। তারপর, জুরির খেয়াল, ঠিক কনভিকশান হবে সহদেবের।

'কি মশাই, এল?' পেস্কারের উদ্দেশে আবার গর্জন করল সহদেব।

'কই!'

'ওদের ঘরে একটা হেলে সাপ ছেড়ে দেবেন নাকি? তবে যদি বেরিয়ে আসে ভয় পেয়ে!'

'মেয়েটা নিজের ইচ্ছেয় বেরিয়েছে, না, সত্যি ভুল বুঝিয়ে বার করে এনেছে ছেলেটা, এই স্থির করতেই হিমসিম খাচ্ছে লোকগুলো।' মাথা চুলকে বললে পেস্কার।

হ্যাঁ, ওই তো কঠিন ঠিক করা, অণিমা নিজের ইচ্ছেয় হোটেলে গিয়েছিল, না, কোনও ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে।

যাই বলো, শেষ পর্যন্ত চলবে না ছলনা, সোজাসুজি অ্যাডালটারিরই

কেস হবে। তাই প্রমাণ হবে সহজে। কেন হবে না ? শশধর বলবে, স্ত্রীকে পায় নি বাড়িতে, বাস-এ করে চুপিচুপি চলে এসেছে না বলে। অণিমার বোন বলবে, বেরিয়ে গেছে গাড়ি চড়ে। হোটেলের ম্যানেজার বলবে, উঠেছে এসে হোটেলে। দু-চারজন হোটেলের ভাড়াটে বাসিন্দে বা খুচরো খদ্দের কোন না পাবে। সাক্ষী দাঁড় করিয়ে রেখে এ ধরনের অন্যায় তো কেউ করে না। প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ না হলেও অনুমানে সিদ্ধান্ত করবে। দুয়ের সঙ্গে দুই যোগ দিয়ে চার করবে, তিন নয়। এক ঘরে দুজনে রয়েছে, দোর বন্ধ, ভেজানোই থাক বা খিল লাগানোই থাক, অত সূক্ষ্ম বুঝবে না মানুষ, বুঝতে চাইবে না। দড়িকে নয়, সাপকেই সাপ দেখবে।

কথা কি, সরল সহজ ব্যাভিচার তো বটেই। পরকীয়া নিয়ে যত তত্ত্বই আওড়াও, পরস্ত্রী তো বটেই। শাস্ত্রে যাই বলুক, আইন শাস্ত্রের চেয়ে বড়।

সুতরাং পালিয়ে যাবার পথ নেই। নীতির দিক থেকে তো বটেই, বিধির দিক থেকেও। এ পাপও, অপরাধও।

'জুরিরা এসেছে হুজুর।' খবর দিল আর্দালি।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, সাড়ে পাঁচ।

'আপনারা একমত ?' ফোরম্যানকে জিগগেস করল সহদেব।

'হ্যাঁ, একমত।' বললে ফোরম্যান।

'আসামী সম্পর্কে কী আপনাদের অভিমত ?'

'দোষী।'

'দোষী ?' আবার শুনতে চাইল সহদেব।

'হ্যাঁ, সর্বসম্মতিক্রমে দোষী।'

ভীষণ বিরক্ত হল সহদেব। আর কিছুর জন্যে নয়, বসে বসে আবার অর্ডার লেখ, জেলে পাঠাবার পরোয়ানা সই কর। তার মানে আরও আধঘণ্টা। নির্দোষ বলত, খালাস দিয়ে এক ছুটে বেরিয়ে পড়ত রাস্তায়। লেখালেখি করতে হত না কিছু।

এরকম ভাবে তার বিরুদ্ধেও দোষী বলবে জুরির দল।

দোষী বলাই তো উচিত। যে বিচারক দণ্ডদাতা, সে নিজেই বলুক না।

উচিত তো কত কিছুই। আসল উচিত ধরা না পড়া। আসামী না হওয়া। নীতির পালন নিজের জন্যে নয়, অন্যকে উপদেশ দেবার জন্যে। এখন যেমন সে দিচ্ছে কালাচাঁদকে। তুমি নিজে যত পার ধার করেও ঘি খেয়ো। যদি পার তামাদি আইনের মারপ্যাঁচে মহাজনকে কলা দেখিয়ো। যা কিছু সুখপ্রদ তাই আচরণ কোর। শুধু সাবধানে কোর, গোপনে কোর, যেন কেউ না দেখে, না ধরে। বিপদ-আপদের কুটোটিও কোথাও রেখো না। বোকামিই পাপ। সুখভোগ যদি নির্বিঘ্ন হয় তা হলেই পুণ্য। তাছাড়া, আমি একটা অপরাধ করছি অথচ কারু সাধ্য নেই আমাকে ধরে, আমি পাপ করছি অথচ কারু সাধ্য নেই আমাকে কেউ কাদা ছোঁড়ে—এমন সব বিধি-ব্যবস্থা করেছি, এমন ভাবে গজ-নৌকো সাজিয়েছি, কারু সাধ্য নেই ভেদ করে ব্যূহ—এই কঠিন সাধনায় উত্তীর্ণ হবার যে কৃতিত্ব, যে নিপুণতা, তারও পুরস্কৃত হওয়া উচিত।

তিনবছর সশ্রম জেল হয়ে গেল কালাচাঁদের।

সব লেখালেখি শেষ করে বেরুতে বেরুতে ছটা।

এখন আর পোশাক বদলানোর সময় নেই, ড্রাইভারকে ঠিকানা দিল সহদেব।

যদিও গলির মধ্যে বাড়ি, বার করতে বেগ পেতে হল না।

এখন পেলে হয় অণিমাকে।

গিয়ে হয়ত শুনবে, আসেই নি। দেখবে সমস্তই একটা ভাঁওতা।

গাড়ি থেকে নেমে সহদেব নিজেই গেল খোঁজ নিতে।

কে একজন বেরিয়ে এসে বললে, 'বাড়ি নেই।'

'তার মানে, এসেছিল?'

'হ্যাঁ, এসেছিল।'

'কোথায় গিয়েছে বলতে পারেন ?'

'হ্যাঁ, কি-এক হোটেলে গেছে কোন এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে।'

'কোন্ হোটেল ?'

পিছন থেকে কে যেন শিখিয়ে দিল, বললে, 'সুধা-হোটেল।'

এ বোধ হয় আরেক ভাঁওতা।

তবু গাড়ি নিয়ে একদৌড়ে চলে এল সুধা-হোটেলে। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল সহদেব। ড্রাইভার থাকে নিচে গাড়িতে, হুইল ধরে। ঘটনার কথা কেউ কিছু বলতে পারে না, যাতে চক্ষের পলকে পালাতে পারে উর্ধ্বশ্বাসে—

উপরে, নিজের ঘরের দিকে এগুতে লাগল। না, পালাবে কেন ? তার ঘর খোলা। আর ঘরের ভিতরে ?

ঘরের ভিতরে অণিমা। একটা ঢালু চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে।

পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকল সহদেব।

'কখন এসেছ ?'

'এই খানিকক্ষণ।' হাসিতে বিকশিত হল অণিমা।

'দরজা খোলালে কী করে ?'

'কেন, ম্যানেজারকে বললাম, তার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি ছিল, চাবি দিল।' যেন কতদিনের অভিজ্ঞ, তেমনি নিশ্চিন্তস্বরে অণিমা বললে।

'কিন্তু', বুক টিপ টিপ করছে সহদেবের : 'কিন্তু, পথ চিনলে কি করে সুধা-হোটেলের ? কিসে এলে ?'

'একলা আসি নি।'

'কার সঙ্গে এসেছ ?

'বা, উনি নিয়ে এসেছেন ?'

'কে উনি ? শশধর ?' চিৎকার করে উঠল সহদেব।

'হ্যাঁ—'

সহদেবের সমস্ত জৌলুষ এক ফুঁয়ে নিবে গেল। তার আর মুকুট

নেই মালা নেই চন্দন নেই দর্পণ নেই। সে নিস্তেজ, নিরর্থক। তবে যে হায়, অ্যাডালটারিও হয় না। স্বামীর স্বীকৃতি আছে, সম্মতি আছে, স্বয়ং সজ্ঞানে পৌঁছে দিচ্ছে হাতে ধরে। কনসেণ্ট বা কনাইভেন্স থেকে যাচ্ছে। তা হলে আর অপরাধ কই? ফৌজদারি কই? ভাস্বর-সুন্দর পাপ কই?

শিল্পসুষমা কই?

'কোথায় শশধর?' গর্জে উঠল সহদেব।

স্থির শান্ত চোখে তাকিয়ে থেকে অণিমা বললে, 'নিচে চায়ের দোকানে অপেক্ষা করছেন।'

'যাই ওকে ডেকে আনি।' বেগে নেমে গেল সহদেব।

গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বললে, 'বাড়ি চল।'

॥ পাশা ॥

'এই, যাবি ?' অতসীর গায়ে ঠেলা মারল মৃদুলা।

বইয়ের থেকে মুখ তুলে অতসী হাঁ হয়ে রইল। বললে, 'কোথায় ?'

'সিনেমা।'

'সিনেমায় ? এখন ?'

'কেন, নাইট শোতে যায় না কেউ ?'

'যায় হয়তো। কিন্তু হোস্টেলের মেয়েরা নয়।'

'কেন, হোস্টেলের মেয়েরা কি রাত জাগতে অপটু ? তারা কি খুকি ?'

'না, একশোবার নয়। কিন্তু তাদের দায়িত্বজ্ঞান আছে, আছে শালীনতার চেতনা—' থমথমে মুখ করল অতসী।

'হোস্টেলের কি-একটা বাজে আইন লঙ্ঘন করতে চাচ্ছি বলেই শালীনতার অভাব হল ?'

'বাজে আইন মানে ?'

'তাছাড়া আবার কি। রাত সাড়ে আটটার মধ্যে সুড়সুড় করে বাড়ি ফিরে আসা চাই, নটাতে গেট বন্ধ, এ-বর্বর আইনের কোনও মানে হয় ?'

'যখন হোস্টেলে নাম লিখিয়েছিলি, তখন এ-আইন ন্যায্য আইন, মেনে চলবি ষোলো আনা, এ-স্বীকার করেছিলি। করিস নি ?'

'একবার যা স্বীকার করা যায়, তা আর পরে খণ্ডন করা যায় না ?'

'না।' আরও গম্ভীর হল অতসী।

'তবে সেদিন যে অরুণা বৃষ্টিতে আটকে গেল, সারা রাত কে-না-

কে-এক দিদির বাড়ি বলে বাইরে কাটাল—পরদিন সকালে এসে হাজির—'

'সেটা তো দুর্ঘটনা, বৃষ্টি—'

'কিন্তু শুধু তো দুর্ঘটনা নয় অঘটনাও তো আছে। কল্যাণী তো কত রাত্রি ফেরেই না হোস্টেলে। শুনতে পাই যাদবপুরে কোন এক ভদ্রলোকের—'

'থাম। শোনা কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।' অতসী ধমকে উঠল।

'কিন্তু কোনও কোনও রাত্রে যে হোস্টেলের বাইরে থাকে, বেড়াতে বেরিয়ে আর ফেরে না, এ তো আর শোনা কথা নয়। এ দেখা কথা। তুই দেখিস নি?'

'দেখলেই সমর্থন করতে হবে?' চোখ তেরছা করল অতসী। 'কিন্তু মেট্রন কী বলে?'

'কিছু বলে না। বলে হোস্টেলের মধ্যে কিছু না হলেই হল। বলে, আর যা কিছু কর, দেখো, গোল পাকিও না।' বলতে গিয়ে হেসে ফেলল মৃত্নলা।

'কিন্তু প্রণতির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছিল মনে নেই?'

'সে প্রণতি মুখে-মুখে তর্ক করেছিল বলে। রাত্রে স্টে-এওয়ে করবার জন্যে নয়।'

'বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ফেরে না, বুঝি, তার যা হক একটা প্লজিবল কৈফিয়তও তৈরী করা যায়। কিন্তু ফিরে এসে বেশি রাতে আবার বেরোয় কে? ফিরবি যখন, তখন তো মাঝ রাত, খুলে দেবে কে দরজা?'

'দারোয়ানকে বলা আছে। দেওয়া আছে বকশিশ। সেই খুলে দেবে। 'কিন্তু', অতসীর চেয়ারের পিঠটা ধরল মৃত্নলা: 'কিন্তু আমি ফিরব না।'

'ফিরবি না মানে? রাত্রে সিনেমার হলে শুয়ে কাটাবি?'

'সিনেমায় যাব না।'

'সিনেমায় যাবি না? সে কি? চেয়ারটা নড়ে উঠল শব্দ করে।

'ঘড়ি দেখেছিস? সিনেমায় যাবার সময় কোথায়? সরকারী আজেবাজে ছবিগুলিও এখন শেষ হয়ে গেছে।'

'তবে তুই যাবি কোথায়?'

'আন্দাজ কর।'

'আন্দাজ করব? ছাত্রী-মেয়ে রাতে হস্টেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে গেট খুলে, সেটা ভাবাই তো কঠিন। শুনি না! যাবি কোথায়?'

চোখের পাতা নাচাল মৃদুলা। 'হোটেলে।'

'তার মানে? চাকরি নিয়েছিস সেখানে? ভোজনশেষে ভুক্ত লোকদের অবশিষ্ট হবার চাকরি?'

'চাকরি নিতে নয়, চাকরি দিতে যাচ্ছি। প্রধানতম চাকরি।'

'সে আবার কি।'

'তার মানে প্রগাঢ়তম। যাচ্ছি রণেনের হোটেলে।'

'ও তোকে বলেছে যেতে?'

'ও আবার বলবে!'

'তবে?'

'যাচ্ছি নিজের জোরে, নিজের গরজে।' চেয়ার থেকে দু পা সরে গেল মৃদুলা। 'আর ওকে বোঝাতে যে আমার গরজেই ওর গরজ।'

'হোটেলে আর-সকলে জেগে নেই? দেখবে না?'

'দেখুক। বয়ে গেল।'

'বয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, আমি তো আর কারু কাছে যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি রণেনের ঘরে। তার একলার এক ঘরে।'

'তোর লজ্জা করছে না বলতে? চেয়ারটা ঘুরিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসল অতসী।

'না আর করছে না। যা সত্য, তাই নগ্ন। আমার গায়ে যদি আগুন লাগে আর আমি যদি সব আবরণের আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলে দিই, তা হলে তুই বলবি তোর লজ্জা করে না নির্লজ্জ হতে? বলবি? চিকিৎসা করাতে এসে লজ্জা ঢাকবার কোনও মানে হয় না।'

'চিকিৎসা?'

'হ্যাঁ, অনেক টোটকা-টুটকা করেছি, অনেক ইঙ্গিত-ইশারা, হোমিওপ্যাথিক ছোট্ট গ্লবিউল থেকে শুরু করে এলোপ্যাথিক ঝাঁঝালো মিকশ্চার পর্যন্ত, কোনও সুরাহা হয় নি। এবার সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরিকে নিয়ে যাব সঙ্গে করে।'

'কে সে?'

'শেষ চেষ্টা দেখতে হবে। সকলেই দেখে। যতই ক্লেশ হক মরীয়া হয়ে সবচেয়ে বড়, দ্রুত ডাক্তার ডাকে। আমিও মরীয়া, আমিও শেষ চেষ্টা দেখব।'

'কিন্তু ডাক্তারটা কে?'

'সেই ডাক্তার আর বেঁচে নেই।'

'বেঁচে নেই?' হাঁ হয়ে গেল অতসী।

'না। ভস্ম হয়ে গিয়েছে। পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী—'

অতসী চেয়ারটা ফিরিয়ে নিল আগের কোণে। বললে, 'ভস্মে ঘি ঢালতে চলেছিস।'

'মোটেই না। ভস্মের মধ্য থেকে খুঁচিয়ে স্ফুলিঙ্গ বার করতে চলেছি। আর, এককণা আগুন পেলেই দাবাগ্নি। অলসকে নিয়ে আসব বিলাসে—'

'বিলাসকে?' ঘাড় বেঁকাল অতসী।

'নিয়ে আসব উল্লাসে। দেখছিস না আমার সাজগোজ?'

'তুই এমনি করে নিক্ষেপ করবি নিজেকে?'

'সুন্দর বলেছিস কিন্তু।' অতসীর কাঁধের উপর হাত রাখল

মৃদুলা। 'নিক্ষেপ করব। লাফের আগে দেখব না তাকিয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ব অন্ধকারে।'

'এতটুকু ধৈর্য নেই?'

'তুই কি বুঝবি। তুই তো পতঙ্গ হয়ে দেখিস নি বহ্নি। সংক্ষেপ করতে চাই, তাই আমি নিক্ষেপে প্রস্তুত।'

'রণেন জানে, যাবি?'

'জানতে দিই নি ঘুণাক্ষরে। ওকে এক-মুহূর্ত সতর্ক হবার সময় দেব না। ধসের মত নেমে পড়ব। অন্ধ সাইক্লোন হয়ে ধাঁধিয়ে দেব ওর অনুভবের শক্তি—'

'যদি গিয়ে দেখি ও ফেরে নি, দরজা বাইরে থেকে তালা দেওয়া, অপেক্ষা করব।'

'তোকে না যেতে ও বারণ করে দিয়েছে?'

'তখন ঝিরঝিরে হাওয়া ছিলাম।' একটু নড়ল-চড়ল মৃদুলা। 'ঝড়কে কে বারণ করে? বুক পেতে বরণ করবে। যা অবারণ তাই বরণীয়? আর যদি গিয়ে দেখি, ঘরে আছে?'

'নক করবি?

'হুদ্দাড় শব্দ করে দরজা খোলাব।'

'যদি না খোলে?'

'লঙ্কায় কী আগুন লেগেছে জানি না, কিন্তু আমি লেজের আগুনে জ্বলছি, আমার উপশম কই? দরজায় মাথা কুটব, কাঁদব, মিনতি করব। কেন খুলবে না? রুগ্নের জন্য, বিপন্নের জন্য এতটুকু দয়া হবে না তার?'

'বেশ, যদি খোলে!'

'তক্ষুনি ঢুকে পড়ে দরজায় খিল চাপিয়ে দেব। হাত বাড়িয়ে দেব সুইচ অফ করে। তাকে জড়িয়ে ধরব, বলব, এ-রাত তোমার ঘরে ভোর করতে এসেছি—'

'ব্যস, আর কোন কথা নেই?'

'কী হবে অনর্থক প্রলাপে? অন্ধকারই কথা কইবে। উত্তুঙ্গের সঙ্গে গভীরের সম্ভাষণ।'

'ছি ছি ছি ছি। এই কি ভদ্রতা, শালীনতা?'

'আহা-হা, রাখ তোর টিপ্পনী। ভদ্র প্রেম, বৈধ প্রেম, শুদ্ধ প্রেম এমন কিছু আছে নাকি সংসারে? ভদ্র প্রেম না সোনার পাথরবাটি। বৈধ প্রেম না কাঁঠালের আমসত্ত্ব। আর শুদ্ধ প্রেম, কি বলব, অশ্বডিম্ব। প্রেম প্রেম। প্রেমের কোনও বিশেষ্য-বিশেষণ নেই।

'কিন্তু, ধর, যদি তোকে গোড়াতেই তাড়িয়ে দেয়।'

'তারই জন্যে তো তোকে সঙ্গে নিতে চাইছি।'

'আমাকে?'

'নইলে তোর সঙ্গে এত বকবক করছি কেন?'

'আমি লঙ্কায়ও নেই, লেজেও নেই—এর মধ্যে আমি কোথায়?'

'তুই আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবি। ও তোকে দেখে বুঝবে, আমি হঠকারী নই, হিতৈষী বন্ধুদের সমর্থনেই আমার আসা। আমার দাবি।'

'বেশ, বলছিস যা হক।'

'হ্যাঁ, আরেকটি মেয়ে আমার সঙ্গে আছে, প্রথমটা ওর চোখে বেশ সরল দেখাবে। আমার মতলব সম্বন্ধে মোটেই হুঁশিয়ার হতে পারবে না। তারপর ঘরে ঢুকে ব্যগ্র হাতে যখন খিল চাপাব—'

'তখন আমার কাজ ফুরিয়েছে, আমি ফিরে আসব একা-একা।'

'বন্ধুর জন্যে কষ্ট একটু না-হয় করলিই বা। আর কষ্ট না ছাই! এই তো দু-তিন মিনিটের পথ—দারোয়ান গেট খুলে দেবে বলা আছে।'

'আমি তো ফিরে এলাম, কিন্তু তোকে, প্রথমে না হক, সব শেষ হবার শেষে, যদি তাড়িয়ে দেয় মাঝরাতে?'

একটুও ভয় পেল না মৃদুলা। বললে, 'তখন তো ফাঁসির দড়ি পরে নিয়েছি গলায়, তাড়িয়ে দিলে নিজেকেও বেরিয়ে পড়তে হবে সঙ্গে সঙ্গে।'

'হঠকারিতার একটা সীমা আছে।'

'হ্যাঁ আছে। আত্মসমর্পণই তার সীমা। সর্বশ্রেষ্ঠ যে ধনী, সর্বোত্তম যে বীর, কী সে দিতে পারে শেষ পর্যন্ত? ওই, ওই আত্ম-সমর্পণ। আত্মসমর্পণই সেরা ধন, সেরা শক্তি। তাই এবার আমি দিয়ে দেব উজাড় করে।' আবার দু পা হাঁটল মৃদুলা: 'যা অলঙ্ঘ্য অনিবার্য, তাকে নইলে পাই কি করে বল?'

'কেলেঙ্কারি করবি তুই। ও নিশ্চয়ই পুলিস ডাকবে।'

'ডাকবে?' চেয়ারের পিঠ ধরে থামল মৃদুলা: 'সত্যি? তাই ডাকুক। সত্যি-সত্যি একটা কেলেঙ্কারি হক। লোক-জানাজানি হক। উঠুক খবরের কাগজে। দরকার হয়তো দাঁড়াই গিয়ে আদালতে।'

'আর তুই ভাবছিস আমি যাব তোর সঙ্গী হয়ে, তোর ঘটকালি করতে?'

'না গেলি। নাই বা দূতী হলি। আমি একাই যাব। তুই ক্ষুদ্র, তুই লঘু, তোর অল্পে তুষ্টি, তুই বুঝবি কি করে এই অধ্যবসায়ের সুখ? তুই তো এক বিধি-নিষেধের পুঁটলি, কি করে জানবি তুই এই সর্বস্বপণ পূর্ণাহুতির আস্বাদ? ভাণ্ডার লুঠ হয়ে যাবার স্ফূর্তি? নিঃস্বতার ঔজ্জ্বল্য?

আলো নিবিয়ে দিল অতসী।

আশ্চর্য, অন্ধকারেই বেরিয়ে গেল মৃদুলা।

'হৃদয়ে প্রেমের সমুদ্র নিয়ে জাগব অথচ স্তব্ধ থাকব, উত্তাল হব অথচ উদ্বেল হব না, এ পারব না সইতে। আর চড়াই-উতরাই চলছে না, এবার স্থির লক্ষ্যে সেই পূর্ণতায়, সেই পরাকাষ্ঠায় গিয়ে পৌঁছুব।

'থামব না, ছাড়ব না, ফিরব না কিছুতেই। ঢিমে-তেতালা ঢোঁড়া সাপ হব না, ফণাতোলা ছোবল-মারা কেউটে হব। দংশন না হলে গরল নেই। সজীব সংযোগ না হলে সিদ্ধি নেই।'

'খবরদার, যাস নি মৃদুলা।'

'তুই তো বারণ করবিই। তুই আমার শত্রু।'

মফঃস্বলী কলেজ, ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল মৃদুলা।

মাকে বললে, 'রণেনদাকে বলো না আমাকে একটু সাহায্য করবে। চারদিকে অন্ধকার দেখছি।'

মায়ের গ্রামসুবাদে কোন্ এক দাদার ছেলে রণেন। গেল বছর বেরিয়ে গেছে ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে। হাতে একটা চাকরি এসে পড়তেই লুফে নিয়েছে চটপট।

'দেখিয়ে দিতে পারি মাঝে মাঝে। কিন্তু পিসিমা, ও একা নয়।' রণেন আবদারের সুরে বললে, 'অন্তত আরেকজন ওর সঙ্গে পড়ুয়া চাই।'

একা হবার সাহস নেই। ভীরু, ঠুনকো। যেন একাধিক হলেই ভিড়, আর ভিড় হলেই আলগোছ হবার সুবিধে।

এক পাড়ার মেয়ে, অতসীকে জোটাল মৃদুলা।

অতসী বললে, 'গোড়াতে শখ করে নিয়েছি বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাখতে পারব, এমন মনে হচ্ছে না।'

'গোড়াতেই শেষের কথা বলতে যাওয়া কোনও কাজের কথা নয়। একদিন মরব বলে এখুনি কান্না জুড়ে দিই আর কি।'

কিন্তু যা ভেবেছিল, অনার্স ছেড়ে দিল অতসী। বললে, 'পায়ের ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে?'

'তুমিও ছেড়ে দেবে নাকি?' মৃদুলাকে জিগগেস করল রণেন।

'পরীক্ষা ছাড়তে পারি, কিন্তু পড়া ছাড়ব না।'

'তার মানে?'

'তার মানে যার বুদ্ধি আছে, সে বুঝুক।'

'যার বুদ্ধি নেই?'

'সে শুধু পড়াক।' হাসল মৃদুলা।

বই বন্ধ করল রণেন। বললে, 'আজ এই পর্যন্ত।' তবু মৃদুলা ওঠে না। 'সেকি? বাড়ি যাও এবার।'

বলেছি তো, 'পরীক্ষা ছাড়লেও পড়া ছাড়ব না। তার মানে বোকাও বোঝে। তার মানে আপনাকে ছাড়ব না।'

'আজকে তো ছাড়।' চেয়ারে দুদ্দাড় শব্দ করে উঠে পড়ল রণেন।

আরেকদিন, পড়াচ্ছে, রণেন লক্ষ্য করল মৃদুলার পড়াতে কান নেই। গালে হাত দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে।

'ও কি, শুনছ না?' রণেন ধমকে উঠল।

'না। দেখছি।'

'কী দেখছ?'

'আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো। যেন তারা ফুটছে আকাশে। সত্যি আপনি কী সুন্দর—কথা সুন্দর?'

বই বন্ধ করল রণেন।

'এবার কী দেখছ?'

"শুধু আকাশ।"

দুদ্দাড় শব্দে আবার উঠে পড়ল রণেন। বললে, 'ফাঁকা আকাশে কিছু হবে না, শুকনো মাটি চাই, নিরেট মজবুত মাটি।'

কি বুঝল কে জানে, মৃদুলা পর দিন কাঁদতে বসল।

প্রথমে টের পায় নি, শেষে ফোঁপানির শব্দে চোখ তুলল রণেন। 'এর মানে? কান্না কিসের?'

সানাই আর বাজায় না, শুধু ধানাই-পানাই করে।

শেষে বললে অনেক কষ্টে, 'আমার পড়তে ভালো লাগে না।'

'খুব ভালো কথা। পড়ো না।' বই বন্ধ করল রণেন।

আশ্চর্য, কথার পিঠে একবারও জিজ্ঞেস করলে না, কী ভালো লাগে! মৃদুলা ভাবল, লোকটা কি আকাট?

বরং বললে উল্টো কথা: 'তবে আর বসে আছ কেন?'

'না, উঠব না।' ভীরুতাকে সংক্রামক হতে দেবে না মৃদুলা। দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'কথাটা শেষ করে যাব।'

'হায় হায়, কথার কি শেষ হয় ?' একটু কি হাসল রণেন ?

'তবু বলতে পারার শেষ হয়।'

'বলো।'

'আমি—আমি—' ঢোক গিলল মৃদুলা, তাকাল উপরে-নিচে। এর চেয়ে বোধহয় বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া সহজ। বললে, 'আমি ভালবাসি।'

'অপূর্ব কথা।' এবার কেন কে জানে জিগগেস করে ফেলল রণেন: 'কাকে ?'

'তোমাকে।'

'আমাকে ? না, তোমার নিজেকে ?'

'তোমাকে।'

'বেশ তো, বাসো না।' যেন কোনও ঝঞ্ঝাটে রাজি নয় এমনি নিস্পৃহভাবে বললে রণেন। 'আপত্তি কি। মনে মনে বাসো। সে বাসায় কোন দিন বাসি নেই।'

রণেনের পুরনো কথা আবৃত্তি করল মৃদুলা: 'ফাঁকা আকাশে আমি বিশ্বাসী নই, আমি শুকনো কঠিন মাটি চাই।'

'তার মানে ?'

'তোমাকে চাই।'

'আমাকে ?' আঙুলটা বুকে না রেখে পেটে রাখল রণেন: 'শেষকালে না উল্টা বুঝিলি রাম হয় ! চড়বার জন্যে ঘোড়া চেয়েছিল, বইবার জন্যে ঘোড়া পেল।'

'বেশ, বইবই সারা জীবন। কিন্তু ঘোড়া যদি আমাকে চায় তবে সে কাঁধে না উঠে নিজেই আমাকে পিঠে তুলে নেবে।'

'তার মানে শুধু তোমার একার চাওয়াতেই হচ্ছে না।' রণেন তাকাল স্থির চোখে।

'না, আমার একার চাওয়াতেই হবে। কেননা তুমি আমাকে চাও এও যে আমারই চাওয়

'তবে, হরে-দরে, আমারও একটা চাওয়া আছে?'

'আছে।'

'তবে এই আমি চাই যে তুমি আর এসো না।' দরজার দিকে মুখ করল রণেন।

কিন্তু এই উপেক্ষার অর্থ কী? ব্রহ্মচর্য না অপৌরুষ? না কি নিষ্ক্রিয় নিব্যূঢ় মূর্খতা!

যেচে প্রেম হয় না, নেচেও হয় না হয় তো, কিন্তু নিয়ত প্রযত্নে কী না হয়? মাটির কলসী রাখতে-রাখতে পাথর পর্যন্ত ক্ষয়ে যায়।

'এ কি, তুমি আবার এসেছ কেন?' ঘরের মধ্যে মৃদুলাকে দেখে বিরক্ত হল রণেন।

'পড়তে আসি নি। যেটুকু পড়িয়েছ তাতেই পুড়িয়েছ যথেষ্ট।' সাহসে ঝলমল করতে করতে চেয়ারে বসল মৃদুলা। 'তোমাকে একটু দেখতে এসেছি। যাকে ভালবাসা যায় তাকে একটু দেখাও কি দোষের?'

'ভালবাসা কি দূর থেকে হয় না? দেখতে চাও তো রাস্তা থেকেও তো দেখা যায়। এত কাছে এসে উপর-পড়া হবার দরকার কি!'

'রণেন, আমার প্রেম অতীন্দ্রিয় নয়, রতীন্দ্রিয়। তুমি কেন আমাকে চাইবে না? আমি কি এতই বাজে, এতই কুচ্ছিত?'

'কে তা বলছে!' ঢোক গিলল রণেন: 'কিন্তু আমার ভালবাসা ঐশ্বরিক।'

'ঈশ্বর-ফিশ্বর মানি না।'

'ঈশ্বর না মানলেও ঐশ্বরিক প্রেম মানা যায়।'

'বাজে কথা। আমি জানি তুমি ওসব মানো না। তুমি সাফল্য চাও, সংসার চাও, সন্তান চাও। আমি—আমিই সব দিতে পারব তোমাকে।'

'কিন্তু আপাতত শান্তি চাই।'

'তুমি যদি আমাকে ফিরিয়ে দাও আমি মরে যাব।'

'মরেই যদি যাবে, এ দেহায়তন ভোগ করবে কি করে? মন্মথের মন মন্থন করবে কি করে? যাও পরীক্ষার বেশি দেরি নেই।'

মরলও না ফিরলও না মৃত্নলা। চিঠি ছাড়তে লাগল। উত্তর দিল রণেন। কিন্তু সে উত্তর আর কিছুই না, পুঞ্জীকৃত ঔদাসীন্য। পিণ্ডীকৃত হিতকথা।

হামাগুড়ি দিয়ে পালানো যাবে না, দু পায়ে ছুটতে হবে। রণেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এল কলকাতা। ঠিক করল শেষ পরীক্ষা, এম-এটা দিয়ে ফেলি।

হাতে রেস্ত কিছু ছিল, সস্তায় না গিয়ে হোটেলে এসে উঠল, একটা একক ঘরে।

কি আশ্চর্য, এখানেও পিছু নিয়েছে মৃত্নলা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, ধরতে পারে না কিছুতেই। রণেন পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ায়, পিছ্‌লে-পিছ্‌লে সরে পড়ে।

টেলিফোন বেজে উঠল হোটেলের। রণেনবাবুকে চাই।

'কে?'

'আমি মৃত্নলা। চিনতে পার?'

'পৃথুলা হলে চিনতাম। আরেকটু যদি বিস্তৃত হও।'

'আমি তোমার ছাত্রী গো—'

'ও! চিনেছি। কি ব্যাপার?'

'আমি কিছু বলতে চাই তোমাকে।'

'বল।'

'ফোনে সে সব কথা হবার নয়। একবার যেতে পারি হোটেলে?'

'ফোনে যে কথা বলা যায় না তেমন কোনও কথা নেই তোমার সঙ্গে।' রিসিভার রেখে দিল রণেন।

'আছে।' সেটা মৃত্নলা নিজে বললে নিজেকে শুনিয়ে।

সটান সেদিন হোটেলে গিয়ে হাজির। পূর্ণ বাক্যের শেষে শান্ত

একটা দাঁড়ি হয়ে নয়, ভাঙা বাক্যের মাঝখানে উদ্ধত একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে।

চারপাশ মোলায়েম দেখাবার জন্যে রণেন প্রশ্ন করল: 'কি, কোন বই-টই চাই? খাতা-পত্র?'

'না, ওসব কিছু চাই না। আমি ছাত্রী নই', মুখে একটি প্রশস্ত হাসি মেলে ধরল মৃদুলা: 'আমি দাত্রী।'

মুখচোখ গম্ভীর করল রণেন। বললে, 'শোন, কে কী ভাববে সেটা শোভন হবে না। যা সমীচীন নয়, ছন্দোময় নয় তা সুন্দরও নয়। রাত হবার আগেই গা-ঢাকা দাও।'

তবু সেদিন শুনেছিল, গা-ঢাকা দিয়েছিল মৃদুলা।

আজ আর শুনবে না।

কেন, কেন এত উপেক্ষা, ঔদাসীন্য, এত প্রত্যাহার? শুধু ছন্দই সুন্দর? উচ্ছৃঙ্খলতা সুন্দর নয়? মেঘই মনোহর? ঝড় মনোহর নয়?

কেন, কেন রণেন জাগবে না? উঠে দাঁড়াবে না? এক স্তূপ বসনের মত বুকের মধ্যে কেন নেবে না আঁকড়ে? ও যেন একটা খেলা পেয়েছে। কিছুতেই বক্র হবে না, বিকৃত হবে না, নিষ্কলঙ্কিত থাকবে, এই এক কৌতুককর খেলা। হঠপূর্বক হটানো। ডাক্তার অস্ত্র করছে করুক, চেঁচাব না, এই এক বাহাদুরি। নিজের নির্দয়তায় নিজের কাঠিন্যে এ এক রকমের মুগ্ধতা। মুগ্ধকে মত্ত করতে হবে, মুক্ত করতে হবে।

সমস্ত ত্রুটি মৃদুলার নিজের। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটি নয়, আঙ্গিকের ত্রুটি।

পায়ের নিচের মাটিতে দেবে না সে আর ঘাস গজাতে। আঁকড়ে ধরবে সময়ের ঝুঁটি। লজ্জা যদি শক্তি, নির্লজ্জতাও শক্তি। আবরণ যদি শক্তি, উন্মোচনও শক্তি।

কী রহস্য, কেন তপ্ত হবে না, ভ্রান্ত হবে না, স্খলিত হবে না?

শুধু জানিয়ে সুখ নেই, জাগিয়ে সুখ।
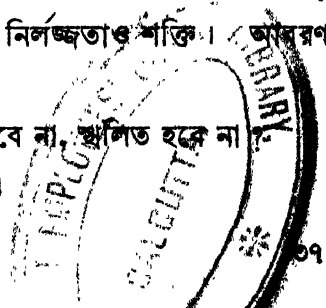
ঘর খোলা। ভিতরে রণেন আছে?

আছে।

আর কিছু প্রশ্ন করবার নেই। স্বতঃসিদ্ধের মত ঢুকে পড়ল মৃদুলা। দরজায় খিল চাপাল। যেন আততায়ী তাড়া করছে ছুরি হাতে তেমনি ভয়ার্ত চেহারা।

'একি, এত রাত্রে? এই ভাবে?' ছাইয়ের মত মুখে বললে রণেন।

'এই ভাবে না হলে কিছু হবে না। আর ইনিয়ে-বিনিয়ে নয়, আমি এবার ছিনিয়ে নিতে এসেছি। গায়ের জোরে জিততে এসেছি এবার। গায়ের জোরে—যৌবনের জোয়ারে—'

'কিন্তু না, এ হয় না।' চারদিকে শূন্যচোখে তাকাতে লাগল রণেন।

'আমি বলছি, হয়।'

'হয়? কিন্তু আমি, আমি কী করব, আমি কী করতে পারি?' মহাজনের কাছে খাতকের মত দুর্বল অসহায় রণেন।

'তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। বন্যতম, ভদ্রতম, যা তোমার খুশি আমাকে ধর মার কাট পিষে ফেল, পুলিসে ধরিয়ে দাও—নয়তো ঘুম পাড়াও, বুকে করে রাখ। একটা কিছু কর আমাকে নিয়ে।'

এক ঢেউ সমুদ্র যেন গণ্ডুষে নিঃশেষ হতে এসেছে।

উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল রণেন। কাশতে লাগল। এ কী কাশি! কাশি হল কবে? এ কি, যেন থামতে চায় না—

টেবিলের তলা থেকে একটা বাটি তুলে নিয়ে নিজের মুখের কাছে ধরল রণেন। টাটকা রক্ত উঠল খানিকটা।

'একি, রক্ত?' এক পা পিছিয়ে গেল মৃদুলা। 'কী হয়েছে তোমার?' সমুদ্র কি পুকুর হয়ে গেল মুহূর্তে?

'আমার টি-বি হয়েছে।' নেতিয়ে পড়ল রণেন।

'আ-হা-হা, কি ভয়ানক, শুয়ে পড় শুয়ে পড়।' আকুল হয়ে

উঠলো মৃদুলা : 'তোমাকে তো তাহলে খুব ডিস্টার্ব করলাম। ছি-ছি!'

পুকুরটুকুনও কি বুজে গেল আস্তে-আস্তে?

'তুমি বিশ্রাম কর, সকালে ডাক্তার ডেক—কে দেখছে? আমি বলি কি, কলেজ-টলেজ ছেড়ে দিয়ে বাইরে কোথাও চেঞ্জে যদি যাও দিন কতক—'

আস্তে-আস্তে বার হয়ে গেল মৃদুলা।

হস্টেলে ফিরে এসে নিজের বিছানায় নিঃস্বত্বের মত পড়ল হুড়মুড় করে।

অতসী হকচকিয়ে উঠল। প্রশ্ন করল : কি রে, চলে এলি?

চলে এসেছে তো বটেই, এটা আবার প্রশ্ন কি! প্রশ্নটা এবার চোখা করল অতসী : 'কি রে, পেয়ে এলি?'

উত্তর দেয় না।

'কি রে, সর্বস্বান্ত হয়ে এলি?'

'মোটেই না। পড়তে-পড়তে সামলে এলাম।' হাঁপধরা লোক যেন হাওয়ায় চলে এসেছে এমনি স্ফূর্তি এখন মৃদুলার : 'হারাতে-হারাতে জিতে এলাম সর্বস্ব। লোকটার টি-বি। অত কাব্য করে বলবার কী হয়েছে? যক্ষ্মা।'

'তাই। তাই ওই ঢঙ, ওই বীরত্বের ছদ্মবেশ। দাঁত নেই বলে মাংস ছাড়া। তাই ঐশ্বরিক প্রেম, বেদান্তের বুকনি। কাঁধে মোহমুদ্গার নিয়ে ব্রহ্মচারী সাজা। কিছুতেই আমি টলি না নড়ি না, আমি অনতিক্রম্য—এই অহঙ্কারের ঝিলিক দেওয়া।

'বেঁচে গিয়েছি। খতম হই নি, ফতুর হই নি। আস্তসমস্ত আছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁকে না মানলেও তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন।'

কদিন পরে অতসী বললে, 'জানিস আমার বিয়ে।'

'মাইরি?' খুশিভরা চোখে জিগগেস করল মৃদুলা : 'বাগানো না লাগানো?'

'আমরা কি বাগাতে পারি ? আমাদের ভাগ্যই লাগিয়ে দেয়।'

'কাকে করছিস ?'

'আবার ব্যাকরণ ভুল করলি। করছি না রে, হচ্ছে।'

'কার সঙ্গে ?'

'তোর রণেনের সঙ্গে।'

'সে কি ? সর্বনাশ ! ওর তো টি-বি—'

'না। ওটা ওর নড়া দাঁতের রক্ত।'

'নড়া দাঁত ?'

'হ্যাঁ, প্রেম পরখ করবার কষ্টি।' বললে অতসী, 'একটা সত্যকে যাচাই করবার রক্তাক্ত মিথ্যে।'

॥ রং নাম্বার ॥

'হ্যালো।' রিসিভার তুলে নিল জয়ন্ত।

'তুমি এখন ফ্রী আছ?' ওপার থেকে জিগগেস করল অরুণিমা।

'না। রং নাম্বার।'

রং নাম্বার মানে ঘরে লোক আছে।

'আচ্ছা। পরে আবার করব। না—এবার তুমি—'

দেওয়ালের কান আছে, কিন্তু এ টেলিফোনের কথা শোনবার আর দ্বিতীয় কান নেই।

কটার সময় করতে হবে বলে দেয় নি।

নটা। যাক আরও দশ মিনিট। হস্টেলে ফিরে আসবার সময় ছাত্রীদের বেলায় আটটা, সুপারিনণ্ডেণ্টের বেলায় আর এক ঘণ্টা বেশী। পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে আরও দশ মিনিট ছেড়ে দেওয়া সমীচীন।

'হ্যালো।' ওপার থেকে আওয়াজ হল। 'কাকে চাই?'

অন্য কোনও মেয়ের গলা। ছাত্রীরা কেউ হয়তো।

'সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আছেন?' জিগগেস করল জয়ন্ত।

'না। এখনও ফেরেন নি।'

'আচ্ছা।'

'কিছু বলতে হবে?'

'না।'

ঘরে ফিরে এসে অরুণিমা শুনল কে তাকে ফোন করেছিল।

ছাত্রী টিপ্পুনী কাটল, 'কে একজন ভদ্রলোক।'

'কে জানে।' তাচ্ছিল্যের ভাব করল অরুণিমা!

নিরালা হলে তাকাল টেলিফোনের দিকে। একবার তুলে নেবে নাকি কানে? ছটা অঙ্ক এদিক ওদিক সন্নিবেশ করার পরই চকিতে শোনা যাবে সেই মধুক্ষরণ কণ্ঠস্বর। শোনা যাবে সেই ডাক, অরুণ, অরুণ, আমার ভোরের অরুণ, লজ্জার অরুণ, কামনার অরুণ—পুরুষের নাম ধরা ডাক শুনতে কী অদ্ভুত যে লাগে। প্রায় সূচ্যগ্র স্পর্শের মত। তুলবে নাকি রিসিভার? মুহূর্তে দেখবে নাকি আশ্চর্যকে? কত দূরে আমি কত দূরে সে। মাঝখানে কত মাঠ কত রাস্তা কত শব্দ কত অন্ধকার। কত বিধি কত বাধা। কিন্তু ছটা অঙ্কের সন্নিবেশ করলেই হৃদয়ের কানে হৃদয়ের মুখ রাখা। আমি তাকে ডাকব জয়, সে ডাকবে অরুণ, আরও একটু গাঢ় হলে রুনি।

কিন্তু এখন ডাকব কি? এখন তার ঘরে তার স্ত্রীর রাজ্য বসেছে। যদি সিনেমায় গিয়ে থাকে ফিরে এসেছে বাড়ি। ছোটদের খাবার টেবিলে ডাক পড়েছে। কিংবা হয়তো রেডিওতে শব্দঝরা নাটক শুনছে। ফোন করতে গেলেই রং নাম্বার হয়ে যাবে।

জয়ন্তেরই উচিত নিজের সময় খুঁজে নেওয়া। কখন অরুণিমা হস্টেলে থাকে বা না থাকে সে শিডিউল তো তাকে দেওয়াই আছে। একটু আধটু ব্যতিক্রম সব নিয়মেরই আছে। তা ছেড়ে দিলে জয়ন্তই তো বেশি নিশ্চিত—সেই তো পারে দড়ির দুই প্রান্ত এক করতে। কিন্তু গরজ তো তার নয় গরজ অরুণিমার।

জয়ন্তের জন্যে তো রয়েছে উপশম। কিন্তু অরুণিমার শয্যাভরা আস্তীর্ণ যন্ত্রণা। আর স্বীকার করতে দোষ কি, অরুণিমা এখনও অচ্ছিন্না কুমারী, অনাঘ্রাতা।

তবু যন্ত্রণায় আমি কাতর হব না, যন্ত্রণায় আমি উজ্জ্বল হব। নির্লজ্জ উজ্জ্বল।

'আমার বড় দোষ—' বলছিল অরুণিমা।

'কী দোষ?' জিগগেস করছিল জয়ন্ত।

'আমি খুব অধীর।'

'অধীরতা তো গুণ।'

'গুণ?'

'অধীরতা তো অপ্রাপ্তিকেও সুস্বাদু করে। অধীরতাই তো অকপট।'

'কিন্তু অধীরতার চেয়ে দৃঢ়তা কি ভাল নয়?' আকুল চোখে তাকিয়েছিল অরুণিমা।

জয়ন্ত হেসেছিল করুণ করে: 'দৃঢ়তা তো স্থবির।'

এখনও বেশেবাসে ঢিলেঢালা হয় নি এরই মধ্যে আবার কতকগুলি মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

আর তক্ষুনি বেজে উঠল টেলিফোন।

'হ্যালো।' অরুণিমা তুলে নিল রিসিভার।

'তুমি একা আছ?'

মুখেচোখে বিরক্তির ঝাঁজ আনল অরুণিমা: 'না। রং নাম্বার।' রিসিভারটা রেখে দিল সশব্দে। যেন ভাগ্যের মুখের উপর ছুঁড়ে মারল।

'তোমরা আবার এখন কী করতে এসেছ?' প্রায় কান্নার মত সুরে রুখে উঠল অরুণিমা: 'আমার শরীর ভাল নেই, আমি তোমাদের পিটিশন ফিটিশন এখন শুনতে পারব না। সব কিছুরই একটা সময় আছে, শ্রী আছে—'

তাড়িয়ে দিল মেয়েদের। দরজা বন্ধ করে দিল।

অরুণিমা তাকাল টেলিফোনের দিকেই, সম্বোধন করে বলল, 'জয়, আমি এখন একা, অভেদ্য, একা, আমাকে কিছু বল, আবার আমাকে বোঝাও—'

কী আর বলবার আছে, কী আর বোঝাবার আছে। অনেক বলেও বলা হয় না, আর যে বোঝাবে সেই বোঝে নি কিছু।

তবু টেলিফোনে কথা বলাটা কী সুন্দর!

নতুন রকম শ্রোতা-বক্তা নতুন রকম সুর। নতুন রকম মন।

সন্নিহিত হয়েও ব্যবহিত। ব্যবহিত হয়েও সন্নিহিত।

অনেক কথা আছে যা মুখে বলা যায় না অথচ চিঠিতে লেখা যায়। অনেক কথা আছে যা মুখেও বলা যায় না চিঠিতে লেখা যায় না অথচ বলা যায় টেলিফোনে। আরেক দেশের আরেক রকম ভাষা। মৌলিকও নয়, লৈখিকও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি অথচ দুটোকেই অতিক্রম করে। রঙ্গমঞ্চে এসেও একটু নেপথ্য থাকা। সম্মুখীন বলতে বলতে আবার খানিক স্বগত বলা।

'কী দেখে আমাকে তুমি ভালবাসলে?'

'কী দেখে? তোমার পৌরুষ? তোমার প্রতিভা? তোমার ঐশ্বর্য? বল না কী বলব? তোমার হৃদয়? সেই তোমাকে যখন বললাম, জান, এত বড় হয়েছি এখনও আমি সমুদ্র দেখি নি, তুমি তার উত্তরে বললে, আমার হৃদয় দেখ। আসল কথা কী জান? আসল কথা, আমাকে কোন পুরুষই দেখে নি হৃদয়ের চোখে, তৃতীয় চোখে। তোমার মাঝেই প্রথম দেখলাম এই তৃতীয় চোখ। তাই তোমাকে দেরি-র মানুষ জেনেও দূরের মানুষ করে রাখতে পারলাম না'

এ সব কথা কি চিঠিতে লেখা যায়? ফাঁকা কাব্যের মত লাগে। বলা যায় মুখে? নাটুকে নাটুকে শোনায়।

এ সব কথার জন্যেই টেলিফোন।

ইচ্ছে করে মাঝরাতে একটা ফোন আসুক। সাধ্যি কি এক ঝলকও ঘণ্টা বাজে। মেয়েদের জিভ তো এমনিতেই নড়ে, ঘণ্টা শুনে কানও নড়তে থাকবে। কত মেয়ের মধ্যরাতেও ঘুম আসে না। হিংসেয় ফেটে যাবে, আহা এই নিশীথস্বর যদি আমার হত!

তবে সেদিন মধ্যরাতে যখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল ফোন এসেছিল অরুণিমার। এমন তুমুল বর্ষণ ঘণ্টার শব্দ পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছিল।

'জান, মধ্যরাতে ডায়াল করতে পর্যন্ত ভয়।' ওপার থেকে বলেছিল জয়ন্ত। 'যদি ও জেগে ওঠে। ও কে বুঝতে পেরেছ তো?'

'পেরেছি। উহ্য থাকলেও যে কর্তৃকারক।'

'সুন্দর বলেছ। কিন্তু আসলে কর্তৃকারিকা।'

'ঘুমুচ্ছেন ?'

'বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন।'

'আলো জ্বেলেছ ?'

'না। আলো জ্বাললেই ধরা পড়ে যাব। টর্চ টিপে নম্বর দেখে ডায়াল করলাম। এখন অমল অন্ধকার।'

'জয়।'

'অরুণ! রুনি!'

এ পরিবেশ কি চিঠিতে হয়? না হয় সাক্ষাৎ-দর্শনে? এ পরিবেশের রচয়িতা টেলিফোন।

সাক্ষাৎ দর্শন কি সোজা কথা? তু জনের কাজ আর ছুটিকে খাপ খাওয়ানোই কঠিন। আর সবচেয়ে অসুবিধা জয়ন্ত যেতে পারে না হস্টেলে, মেয়েদের হস্টেল, আর অরুণিমা যেতে পারে না জয়ন্তের বাড়ি যেখানে তার স্ত্রী নীলাক্ষী রয়েছে একচ্ছত্রী।

জয়ন্তের যে ছুটি তার বেশীর ভাগ নীলাক্ষীই গ্রাস করে নিয়েছে আর অরুণিমার যা ছুটি তা থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি।

তা টেলিফোনেও যখন রং নাম্বার, ছাত্রীদের কান-নাড়া, তখন চিঠি ছাড়া আর গতি কি! সভ্য সমাজে ভাগ্যিস সম্ভ্রান্ত একটা নিয়ম ছিল যে পরের চিঠি খুলে পড়া হয় না। তাই আর সেদিকে কোনও আলোড়ন ছিল না। শান্তির সরোবর বলতে চিঠিই। নাই বা থাকল তাতে টেলিফোনের শিহরণ।

এরই মধ্যে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এখানে ঠেকো ওখানে গোঁজা দিয়ে, এ-ঘরের ঘুঁটি ও-ঘরে বসিয়ে, গোল গর্তে চৌকো খুঁটি—মাঝে মধ্যে দেখা হয়েছে তাদের।

সেদিন দেখা করেছে একটা পার্কের ফটকে। তারপর তুজনে

ভিতরে ঢুকে—একটাও খালি বেঞ্চি নেই—বসেছে ঘাসের উপর। নিরিবিলি একটু ঘাস পাওয়াও দুষ্কর।

'জান তোমার কাছে আমি একটি উপহার চাই।' বললে অরুণিমা।

'বেশ তো, বল, কি চাও। তাহলে বসলে কেন? ওঠ।'

তাড়া দিল জয়ন্ত। 'দোকানগুলো এখন ও বন্ধ হয়·নি। আর পকেটে আজ আমার যথেষ্ট টাকা আছে।'

'টাকা?' পাথরের চোখে তাকাল অরুণিমা।

'টাকাই তো সামামবোনাম। কাঞ্চনের আসল হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা।' হঠাৎ একেবারে মাটিতে নেমে এল জয়ন্ত: 'টাকা দিয়েই তো শাড়ি গহনা বই ঘড়ি—যা চাও।'

'আমি তোমার কাছে শাড়ি গহনা চাই?'

'চাইলে ক্ষতি কি! চাওয়াই তো উচিত।' হাসল জয়ন্ত: 'ভরণ বলতে আভরণ আর পোষণ বলতে পোশাক—'

'না, ওসব নয়।' গম্ভীর হল অরুণিমা: 'আমি তোমার কাছে একটা ছোট্ট জিনিষ চাই।'

'ছোট্ট?'

'হ্যাঁ, বলতে পারো সূচ্যগ্র। একটা স্থায়িত্বের চিহ্ন।'

'সে আবার কি?'

হাতব্যাগ থেকে ছোট একটা রুপোর কৌটো বার করল অরুণিমা। খুলল। খুলে দেখাল। আলোতে জয়ন্ত দেখল, সিঁদুর।

খোলা কৌটো এগিয়ে দিয়ে অরুণিমা বললে, 'তোমার আঙুল করে এর এক ফোঁটা আমার কপালে আর সিঁথেয় দিয়ে দাও।'

হো—হো করে হেসে উঠল জয়ন্ত। বললে, 'চাঁদ ওঠে নি তো আকাশে? এ বুঝি চাঁদ সাক্ষী করে বিয়ে করা।'

'তা জানি না।' কৌটো সরিয়ে নিল না অরুণিমা।

'তুমি ভাবছ এমনি একটা ফোঁটা তিলক কাটলেই তুমি আমার অ্যাডিশনাল বউ হয়ে গেলে।'

'তাছাড়া আবার কি। লোকের তো একাধিক বউ থাকে।
স্ত্রী হয়ে আমি তো তোমার কাছ থেকে ভরণ-পোষণ চাইব না।'
দৃঢ়তর হল অরুণিমার: 'আমি একাই দাঁড়াতে পারব নিজের পা।
শুধু কপালে একটা জয়টীকা পরে বেড়ানো। ঝুঁকি যে নিতে পারি
তার সাইনবোর্ড এঁটে চলা। নির্ভয় হয়ে চলা। তারপর সত্যি যদি
ঝুঁকি নেবার দিন আসে—'

থামা হাসিটা আবার খুঁচিয়ে তুলল অরুণিমা। জয়ন্ত বললে,
'লোকে জিজ্ঞেস করলে কী বলবে!'

'বলব বিয়ে করে এলাম। ছাত্রীরা কুমারী, আমিও কুমারী।
ওরা যদি এ বেলা বেরিয়ে ও বেলা বিয়ে করে আসতে পারে, আমি
ওদের কর্ত্রী, আমি পারব না?'

'স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করলে কী বলবে।'

'স্বামীর নাম বলা বারণ, কেউ জিজ্ঞেসও করবে না। যদি করে,
যদি নেহাৎ বলতেই হয় বানিয়ে বলব। কিন্তু অন্তরে-অন্তরে জানব
কে আমার নিরন্তর।'

খোঁচানো আগুন দাউ দাউ করে উঠল।

'এত তোমার হাসবার কী হয়েছে?' আহতের মত প্রশ্ন করল
অরুণিমা।

'একাধিক বিয়ে আর নেই।' হতাশার সুর মিশিয়ে জয়ন্ত বললে,
'সে স্বর্ণযুগের অবসান হয়েছে। নতুন আইন নতুন আশার পায়ে
কুড়ুল মেরেছে।'

'তার মানে?'

'তার মানে এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে আরেক মেয়েকে বিয়ে করা
অবৈধ।'

এক মুহূর্ত দেরি করল না অরুণিমা, নিষ্ঠুর আগ্রহে বললে, 'বেশ,
যাতে বৈধ হয় তাই কর।'

স্তব্ধ হয়ে গেল জয়ন্ত।

অরুণিমা সরে এল একটু ঘন হয়ে। বললে, 'আমাকে তাহলে তুমি ভালবাস না ?'

'ভীষণ, ভীষণ ভালবাসি। এ কথা বলতে দ্বিধা কোথায় ? বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে বলতে পারি তা গলা ছেড়ে।' অরুণিমার বাঁ হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল জয়ন্ত : 'এমন লাবণ্যের প্রতিমা আর কে আছে ! কোথায় এমন মর্মরের মসৃণতা ? ফাট নেই, খিঁচ নেই, আঁশ নেই, ঢালা নির্মলতার স্রোত। জীবনে এত স্বাদ এত শ্রী এত উৎসাহ আর কে দিল।'

কী হল আজ অরুণিমার ? চোখ ভরা জ্বলন্ত অশ্রু নিয়ে বললে, 'তুমি আমাকে চাও না প্রবলের মত, পুরুষের মত !'

'বলতেই পারি চাই, কিন্তু চাইতে পারার মত বল কই, আইন কই !' জয়ন্ত ঘাস ছিঁড়তে লাগল।

'তার মানেই তাই।'

'কিসের মানে !'

'ভালবাসার মানে। তার মানেই তুমি আমাকে ভালবাস না।'

'তাহলে বল বুকের নিশ্বাসকে ভালবাসি না। ভালবাসি না মুখের খাদ্য। চোখের সুনিদ্রা।' জয়ন্ত দুই চোখে তাকাল। বয়স একটু বেশি হয়েছে, তা হোক, কার বা না হবে বাঁচলে। বয়স একটা মায়া ছাড়া কিছু নয়। আভাস মাত্র। অবিদ্যার কল্পনা। আভাসে যাই হোক, সন্দেহ কি, অক্লিন্ন। অনিন্দিতা। কবিতার খাতার অলিখিত পৃষ্ঠার মত শুভ্র। জয়ন্ত আরও বললে, 'তোমাকে ভাল না বাসা মানে জীবনকে অস্বীকার করা, পরের ঘরে পোষ্য দেওয়া—'

'তাহলে,' নিজেই এবার জয়ন্তের হাত ধরল অরুণিমা : 'বিয়েটা বৈধ করে নাও।'

'তার আগে বিচার করে দেখ আমি কি বিয়ের পক্ষে উপযুক্ত ? মজবুত ?'

'টেঁকসই ! আমি নড়বড়ে হয়ে গেছি না ? তুমি মরচে পড়া ভোঁতা

তরোয়াল নেবে কেন? তুমি নেবে তাজা টাটকা শানের জৌলুসী লাগানো তরোয়াল!'

আগুন, আগুন। কোন্ কাঠের আগুন, অশ্বত্থের না পাকুড়ের, এ পতঙ্গের জিজ্ঞাস্য নয়। প্রেম, প্রেম। প্যাশান-ফ্যাশান মেনে চলে না।

'কিন্তু তোমার সঙ্গে বিয়েটা বৈধ করতে হলে স্ত্রীকে, নীলাক্ষীকে ছাড়তে হয়।' বললে জয়ন্ত।

'খুব কঠিন বুঝি?' যেন চোখের কোণ থেকে বাণ ছুঁড়ে মারল অরুণিমা।

'ছাড়া কিছু কঠিন নয়। পুরনো হয়ে গিয়েছে, একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে, নানাভাবে জীবনে নানা উৎপাত ঘটাচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপে সন্দেহের কাঁটা, কে চিঠি লিখল, কে ফোন করল, কোথায় কী কার কথা একটু লিখলাম ডায়রিতে, কেন বাড়ি ফিরতে উৎরে গেল সন্ধ্যা। জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে—কিন্তু—সর্বস্বহীন নিঃস্বের মত তাকাল জয়ন্ত।

'কিন্তু—'

'ছাড়তে হলে আইনে একটা ওজুহাত লাগবে। কোনও একটা বিশেষ দোষে দোষী হতে হবে। শুধু রাগী শুধু সন্দিগ্ধ শুধু দুর্মুখ এই কারণে ছেড়ে দেওয়া চলবে না।' অসহায় শোনাল জয়ন্তকে: 'তেমন কোনও দোষ তো খুঁজে পাচ্ছি না নীলাক্ষীতে—' তারপর আদালতের বারান্দায় এসে যেমন বখশিশ দেয় তেমনি বোধহয় স্তোক দিল জয়ন্ত। 'আচ্ছা, দেখি—'

সিঁদুরের কৌটো ফিরিয়ে নিল না অরুণিমা। ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

কিন্তু তার নিগূঢ়ের দাবি ছুঁড়ে ফেলে দিল না মাটীতে।

চিঠি লিখল: 'তোমাকে আমার চাই। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। বাবা এবার আমার বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। কোন এক মফস্বলী হাকিম পাকড়ে এনেছেন আমার জন্যে। ছোট বোন

মধুরিমাকে বলেছি তার গতি করতে। ছোট ভাই দেবলদের ম্যাগাজিনে সেই যে ছোট্ট কবিতাটা দিয়েছ সেটা আমারও মনের কথা। স্পর্শমণির মনে কোন দ্বৈধ নেই এ লোহা কসাইয়ের খড়্গের না পুরোহিতের পূজার। তেমনি প্রেমের মনেও কোন বিচার নেই এ বৈধ না অবৈধ। আমি বাবাকে বলে দিয়েছি আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ঈস, যদি একটা জীবন্ত প্রমাণ থাকত, যদি অন্তত একটা শিশু থাকত আমার—'

'হ্যালো—' সাড়া দিল অরুণিমা।

'আমি।'

'রং নাম্বার না তো ?'

'না। রং নাম্বার সিনেমায়।'

'শোন, আমার চিঠি পেয়েছ ?'

'পেয়েছি। পেয়েছি বলেই তো—কী সাংঘাতিক চিঠি।'

'মোটেই সাংঘাতিক নয়। তুমি তো দেখি বলে কত ভাবলে। শেষকালে আমিই ভেবে দেখলাম—'

'কী দেখলে ?'

'দেখলাম বৈধে দরকার নেই। অবৈধেই আমি খুশি। অবৈধই আমার ঐশ্বর্য। তোমাকে না পাই, তোমার—'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।'

'মাথা খারাপ না হলে কি ভালবাসি ? জেনে শুনে অথচ চোখ বেঁধে অসম্ভবে ঝাঁপ দিই ? সামান্য হয়ে গণ্যমান্যকে স্তব করি ? শোন—যেন কোন সাজানো শহরে আগুন লেগেছে এমনি একটা মিলিত কোলাহলের স্বর : 'শোন, তোমাকে না পাই তোমার সার-সত্তাকে চাই।' আমি তোরে ভালবাসি অস্থিমাংসসহ—সেই প্রেমের কথা পড় নি !' তোরে, তোমারে নয়। আমারও সেই ক্ষুধা। অস্থির, অস্থি-র ভালবাসা। আমি ছিন্নমস্তা, নিজের মাথা কেটে নিজের রক্তে স্নান করি। শোন, আমাকে অবৈধই দাও—'

'তার মানে!'

'তার মানে তাই। ডাস্টবিন থেকে ছেলে কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এসে আমি শুধু এক মফঃস্বলী হাকিমকে নিরস্ত করতে চাই না, আমি আমার নিজস্বকে চাই নির্বাচিত নিজস্ব। সমস্ত কিছু পঙ্গু হয়ে যাক এক সঙ্গে। জগৎ সংসার চিরদিনের জন্যে নিরস্ত হোক।'

'তোমার চাকরি যাবে।'

'যাক। আমি অন্য জায়গায় গিয়ে চাকরি পাব। বিধবা সাজব। জবালা হব। তোমার কাছ থেকে এক পয়সা চাইব না। ওকে আমি মানুষ করব। আমার মনের মত মানুষ। কে জানে তোমার চেয়েও হয়তো বড় মানুষ—'

'পরিচয় দেবে কী ওর!'

'পরিচয় আবার কী! আমার ছেলে।'

'তা নেবে না সমাজ। যখন বড় হবে স্কুলে পড়বে তখন বাপের নাম লাগবে— কী বলবে তখন?'

'তোমার নাম বলবে।'

ফোনের মধ্যেই হেসে উঠল জয়ন্ত। 'প্রমাণ কী? যে কোনও মেয়ে তার পেটের ছেলেকে যে কোনও পুরুষের বলে চালাতে চাইলেই চলে না—প্রমাণ কী?'

অরুণিমা নির্বিকার। 'প্রমাণ হবে না। সব বস্তুই আদালতের নয়। কত জিনিষই তো প্রমাণ হয় না। তাতে কী যায় আসে? প্রমাণ ছাড়াও সংসার ঠিক চলে যাচ্ছে—'

'আমি অস্বীকার করব।'

'কোরো। আমিও বলব তোমাকে তাই করতে। তবু প্রেম বল, কলঙ্ক বল, প্রেমের চন্দন বা কর্দমের তিলক বল, ও আমার।

'তোমার মুখে চুনকালি পড়বে।'

'তবু তোমার মুখে না পড়ুক। তোমাকে আমি আড়াল করে রাখব। কোনও দাবী সাব্যস্ত করতে দাঁড়াব না তোমার দুয়ারে।

রাস্তায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব না। আমার নিজের জিনিস নিজে লুকিয়ে রাখব। তুমি আমাকে দিয়েছ। ভালবেসে কত জিনিসই তো দেয়, নেয়, পায় এই সংসারে। তোমার কাছে না হোক, আমার কাছে প্রমাণ হোক। একটি শুধু প্রমাণ দাও আমাকে।'

'কিসের? আমার ভালবাসার?'

'না, আমার ভালবাসার। আমি যে তোমাকে ভালবাসলাম তার স্থির প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রমাণ। যদি কলঙ্কসাগরে নাই ভাসতে পারলাম তাহলে কিসের ছাই আমার ভালবাসা?'

রিসিভার রেখে দিল জয়ন্ত। 'আচ্ছা, দেখি—' ভয়ে ফুটল না বুঝি কণ্ঠস্বর।

ভয়ই শীতল সুন্দর। নীরব সুন্দর। সেই সুন্দরকে কতক্ষণ তুমি শীতল করে রাখবে, নীরব করে রাখবে!

আবার কদিন পরে জয়ন্ত রিসিভার তুলল।

একবার খোঁজ নিতে হয়। একটা বিঘটন কিছু করে না বসে। দড়িটা না ফাঁস হয়ে যায়।

'হ্যালো, রং নাম্বার?'

'না।'

'কী বৃষ্টি হচ্ছে বল তো।'

'ভীষণ। একবার আসতে পার না এই বৃষ্টিতে?'

'কী বলছ! সমস্ত রাস্তা নদী হয়ে গেছে কিন্তু গাড়ি তো নৌকো হয় নি। ভাসা যায়, আসা যায় না।' বললে জয়ন্ত। 'কোনও উপায়ে কোনও মন্ত্রে কোনও জাদুবলে, ছোট্ট একটা মাছি হয়ে, দরজার জানলার কোন একটা অজানা ফাঁক দিয়ে—'

'মাছি হয়ে?' হাসল নাকি জয়ন্ত!

'এককণা বারুদের মুহূর্ত হয়ে—'

'কিন্তু তোমার দরজায় দারোয়ান বসা, অপরিচিত আগন্তুককে ঢুকতে দেবে কেন?'

'তা জানি না, শুধু এই জানি—'

'হাতে হাতকড়া পড়বে। খবরের কাগজের শীর্ষাক্ষর উজ্জ্বল হবে। তার চেয়ে তুমি এস।'

'কোথায় ?'

'আমার বাড়িতে। খরার দিনে।'

'সত্যি বলছ ?' মাটির তলার অদৃশ্য টেলিফোনের তার ঝংকৃত হল। 'সেই বাঘের বাচ্চা ছাগলের পালের সঙ্গে মানুষ হচ্ছিল, ঘাস খাচ্ছিল, তারপর বনের জ্যান্ত জ্বলন্ত বাঘ এসে তাকে জলের ধারে নিয়ে গিয়ে তার মুখের ছায়া দেখাল জলে, দিল মাংস খেতে, রক্তের স্বাদ পেতে—দেবে ? এই ক্ষুদ্রতম বিন্দুতম স্বাদ—দেবে ?

'দেব। চিনবে তো বাড়ি ?'

'খুব চিনব। কতবার লুকিয়ে দেখে এসেছি। দোতলায় তোমার ঘরের আভাস, বারান্দায় ফুলের টব সাজানো। সেদিন দেখলাম এক ভদ্রমহিলা টবে জল দিচ্ছেন—ওই বুঝি তোমার স্ত্রী—নীলাক্ষী—'

'হ্যাঁ, আরেক টব।'

'কিন্তু যাব কি ! আমার দারোয়ান তো বাইরে তোমার দারোয়ান ভিতরে।'

'এমন এক লগ্নে ডাকব যখন দারোয়ান থাকবে না।'

'থাকবে না মানে ? কোথায় যাবে ?'

'কোনও এক আত্মীয়ের বাড়ি এক রাত্রির জন্যে স্থানান্তরিত করব। বিয়ে-থা তো এখনো উঠে যায় নি সমাজ থেকে।' হাসল বুঝি জয়ন্ত। 'তেমনি এক ঢাউস নিমন্ত্রণে চালান করে দেব একদিন।'

'তাই থাকব অপেক্ষা করে।'

'হ্যাঁ, অপেক্ষা কর। শান্ত হও। ঠাণ্ডা থাক।'

কদিন পরে চিঠি এল অরুণিমার : 'তুমি আর ডাকলে না। আমি চলে যাচ্ছি। কলকাতার বাইরে কালিম্পঙে কাজ পেয়েছি। কলকাতায় আর আমার আর কিসের আকর্ষণ। যাবার আগে আর

একবার দেখা হয় না? আমার দাবি কত, কত কমিয়ে এনেছি। পাই না একটা হীরের টুকরো? অন্তত একটি চুম্বন। একটি সামান্য উপহার?'

'হ্যালো—' রিসিভার তুলল জয়ন্ত।

'হ্যাঁ, আমি।'

'রং নাম্বার?'

'না, একা আছি।'

'চলে যাচ্ছ?' জয়ন্তর কণ্ঠস্বরে বিষাদের সুর?

'যেতে তো হবেই।'

'কোথায় যাবে! যেখানেই যাবে হাত যাবে আমার। আইনের শুনেছি দীর্ঘ হাত কিন্তু বেআইনের হাত, প্রেমের হাত, দীর্ঘতর। শোন—'

'কান পেতে আছি।'

'নিমন্ত্রণ করছি তোমাকে। কাল সন্ধ্যায় এস।'

'বল কি? যাব?'

'হ্যাঁ, লগ্ন প্রস্তুত করেছি।'

'তোমার জ্যান্ত ফুলের টব?'

'সে তার দিদির বাড়ি যাচ্ছে। তার বোনঝির বিয়ে।'

'তুমি যাবে না?'

'আমার তখন জরুরি কাজ থাকবে। আমি পরে যাব। চাই কি তোমাকে তোমার হোস্টেলে ড্রপ করে যাব বিয়ে বাড়ি।'

'কটায় লগ্ন?'

'কার? বোনঝির?'

'না। আমার।'

'তুমি এই সাতটা নাগাদ এস।'

'সন্ধ্যায়?'

'তাই তো ভালো। যথাসময়ে ফিরতে পারবে হস্টেলে।'

'ফিরতে পারব ?'

'ফিরতে পারাই তো স্বস্তি। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো !'

চারতলা বাড়ির দোতলা ফ্ল্যাটে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল অরুণিমা।

থমথম করছে চারপাশ। থমথম করছে তার পা ফেলায়, তার হৃৎপিণ্ডের শব্দে। একটু ভয় এসে মিশলে সন্ধ্যাকেও গভীর রাত্রি বলে মনে হয়।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল অরুণিমা। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এসেছে।

দরজায় টোকা দিতেই বেরিয়ে এল জয়ন্ত।

'এস।'

'কি, রং নাম্বার ?' একটু হাসল বুঝি অরুণিমা।

'ইংরিজি রং নয়, বাঙলা রং। তুমিই এখন রং নাম্বার।'

শোবার ঘরে নিয়ে এল জয়ন্ত।

ব্যূহে প্রবেশ করাই কঠিন, বেরুনো কঠিন নয়।

'দরজাটা বন্ধ করে দেব না ?' জিজ্ঞেস করল অরুণিমা।

'কেন, ভয়ের কী !' পরদাটা টেনে দিল জয়ন্ত।

অরুণিমা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল বাড়িঘর। এমন কি বারান্দার টবগুলি পর্যন্ত। কোনটায় ফুল কোনটায় শুধু গাছ।

ঘরে সরে এসে বললে, 'একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।'

'কত গাড়ি দাঁড়াচ্ছে চলে যাচ্ছে।' উদাসীনের মত বললে জয়ন্ত। 'তুমি বোস। তোমাকে দেখি।'

বসল অরুণিমা।

'সিঁড়িতে জুতোর শব্দ।'

'কত ফ্ল্যাট, হরদম লোক আসছে যাচ্ছে, উঠছে নামছে।' অভয়ের হাসি হাসল জয়ন্ত। 'তুমি খোলা দরজাকে ভয় পাচ্ছ বুঝি ? দরজা বন্ধ থাকলেও তো হামলা হতে পারে। পরদাই তো ভদ্র বুদ্ধিমান।'

ইঙ্গিতে গভীর হল জয়ন্ত। লগ্ন যখন পরিপক্ক হবে ঠিক সেই মুহূর্তেই— দরজার দিকে তাকাল।

সিঁড়ির জুতোর শব্দ বাইরে এসে থামল।

সর্ব শরীরে হাসতে হাসতে ঢুকল নীলাক্ষী। ঘরের মধ্যে আগন্তুক মহিলা দেখেও নিষ্প্রভ হল না। জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে বললে, 'দেখ কী আশ্চর্য, শাড়ির বাক্সটাই ফেলে গেছি—'

'শাড়ির বাক্স?' দাঁড়িয়ে পড়ল জয়ন্ত।

'যেটা মেয়েকে প্রেজেন্ট দেব। বেনারসী। ওই যে ফেলে গেছি খাটের উপর।' হাসিমুখে নীলাক্ষী কুড়িয়ে নিল বাক্সটা। বললে, 'মাঝপথে গিয়ে খেয়াল হল। গাড়ি ফিরিয়ে আনলাম।'

চলে যাচ্ছিল আবার ফিরল নীলাক্ষী।

'আপনিই বুঝি অরুণিমা? রুনি? তা আপনি তো বেশ দেখতে। কী বা বয়েস? পঁচিশ? তিরিশ? সেই মফস্বলী হাকিম মন্দ ছিল কী! মধুরিমাকে কেন? আগে অরুণিমা পরে মধুরিমা!'

'শোন। ওকে কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দিয়ো না।' দরজার বাইরে গিয়েছিল আবার ফিরল নীলাক্ষী: 'কালিম্পং কবে যাচ্ছেন? আমি সব তৈরি করে রেখেছি মিটসেফে। খুলে দিতে পারবে তো? চাকরটা কোথায়, বাইরে? ডাক না ওকে। চলে যাবার আগে মিষ্টিমুখ করে যেতে হয়। আমি ভাই থাকতে পারছি না। খেয়ে যেয়ো কিন্তু—'

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নীলাক্ষী।

পরক্ষণেই মন্থর পায়ে নামতে লাগল অরুণিমা।

পিছে পিছে নীচে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল জয়ন্ত। রাস্তায় পড়ে অরুণিমা তার দিকে ফিরে তাকালো। আর্দ্রস্বরে বললে, 'চলে যাচ্ছি। আর কিছু চাই না। শুধু মনে রেখো। মনে স্থান দিয়ো।'

॥ জানলা ॥

ভীষণ শব্দে জানলাটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

ঝড় উঠেছে নাকি?

না, ঝড় কোথায়? দিব্যি মোলায়েম চুপচাপ চারদিকে। তেমন একটা ভারী গাড়িটাড়িও তো যায় নি রাস্তা দিয়ে। একটা বোমা-টোমা ফাটবার মতও কিছু হয় নি।

এ ঠিক জানলা বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়, এ সজোরে জানলাটা বন্ধ করে দেওয়া, ওপার থেকে জানলার পাল্লা দুটো এপারের দিকে ছুঁড়ে মারা। একটা বন্দুক ছুঁড়তে পারে নি বলেই যেন জানলাটা ছুঁড়ে মেরেছে।

জানলার কাঠ দুটো ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে মাঝখানে একটা ফাঁকা রেখে দাঁড়িয়েছে স্তব্ধ হয়ে। যদি জানলা বন্ধ করাই উদ্দেশ্য হত, তা হলে এখনকার এই ফাঁকটা রাখত না জীইয়ে।

এ যেন একটা ধিক্কার ছুঁড়ে মারা।

যূথিকা গম্ভীর হয়ে গেল।

উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখল, সামনের ঘরে জয়ার কাণ্ড। রণদীপ্ত মুখে রাগ যেন গরগর করছে। জানলাটা ছুঁড়ে দিয়েই সরে গেছে আলগা হয়ে।

যেন, তোমার মুখ দেখব না, তোমার মুখ দেখাও পাপ, এই রকম বলা ধমক দিয়ে। তোমার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেওয়া উচিত, যেন এমনি একটা রূঢ় তর্জন।

কার উপর এই নিক্ষেপ?

যূথিকা তাকিয়ে দেখল, চেয়ারে-বসা বিভাস কি-একটা বই দেখছে নিচু চোখে। নির্লিপ্ত শৈথিল্যে।

যেন এত বড় সশব্দ অভদ্রতা চোখ তুলে চেয়ে দেখবার মত নয়। রাস্তায় হামেশা কত ঠোকাঠুকির শব্দ হয়, মোটরের কত টায়ার ফাটে, এ যেন তেমনি। ত্রস্তব্যস্ত হবার কিছু নেই।

এই তো সবে এরা পা দিয়েছে এ বাড়িতে, ও-পাশের ঘরে মেসোমশায়ের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে বিস্তৃত হয়ে বসেছে এ-ঘরে, এ-ঘরে এখনও প্রচলিত অতিথি সৎকার হয় নি, মাসিমা হয়তো তাই জোগাড় করছেন রান্নাঘরে, জয়ারই তাতে হাত লাগানো উচিত, কিন্তু, বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ ছুটে এসে মুখোমুখি উল্টো ঘর থেকে এমনি প্রচণ্ড শব্দে জানলা ছুঁড়ে মারার মানে কি?

বুকের ভিতরটা কালো হয়ে উঠল যূথিকার।

বিভাসকে লক্ষ্য করে বললে, 'এবার যাবে?'

বইয়ের থেকে চমকে উঠল বিভাস। বললে, 'মন্দ কি?'

ও-ঘর থেকে সুশীলবাবু তেড়ে এলেন: 'সে কি কথা! এইতো এলে সবে—'

রান্নাঘর থেকে মাসিমা বলে উঠল: 'যাস নে, আমি চা করে আনছি।'

জয়া একটাও কথা বললে না।

হাসিতে-খুশিতে ঝলমল মেয়েটা। এ সময় ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাত বাড়িয়ে তার পথ আটকাবার কথা। কিন্তু কেমন যেন অন্য রকম। গম্ভীর-গম্ভীর। প্রায় বিখণ্ডিনী মূর্তি।

কালই তো তাদের বাড়ি গিয়েছিল জয়া। বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কত হৈ চৈ করেছে, ছাদে-বারান্দায় কত শিথিল সরল ছুটোছুটি। নবীন নিবিড় মেয়েটা, জল-ভরা ঘট, কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছে একদিনে। শরীরের খেলায় যে খোলা ছুরির ঝলক ছিল, তা যেন লোপাট হয়ে গিয়েছে। চোখে কালো জ্বালার ধার।

একদিনে কী এমন হতে পারে ব্যাপার ?

কাল জয়াকে বাড়ি ফিরিয়ে দেবার সময় বিভাস কি ছিল গাড়িতে ?

সমস্ত ভাবনা জুড়ে মেঘ করে এল যূথিকার।

কাল শনিবার ছিল। যূথিকা ফিরেছিল বিকেল তিনটেয়। বিভাস পাঁচটায়। জয়ারা এসেছিল সন্ধ্যের দিকে। না, জয়ারা কোথায়—জয়া একাই এসেছিল – ও এখন বেশ একা-একা চলতে-ফিরতে পারে—কিন্তু দাঁড়াও, গেল কখন ?

কি আশ্চর্য, কালকের মাত্র ব্যাপার, চব্বিশ ঘণ্টাও হয় নি, অথচ ঠিক-ঠিক কিছু মনে করতে পারছে না যূথিকা। আজকাল কিছুই সে তেমন মনে রাখতে পারে না। সব ঢালা-উপুড় হয়ে যাচ্ছে। তার বয়স বাড়ছে। সে বুড়ো হচ্ছে।

দাঁড়াও, হ্যাঁ, উনি বাড়ি ছিলেন যখন জয়া এল।

কিন্তু, যখন গেল ? হ্যাঁ, গাড়ি বেরুল গারাজ থেকে। জয়া উঠল, ঠিকই তো উনিও উঠলেন। হ্যাঁ, না, ঠিক, উনি তো ড্রাইভারের পাশে বসলেন না, ভিতরেই বসলেন।

বুকটা দুরদুর করতে লাগল যূথিকার।

তারপর গাড়িটা ছাড়ল।

না, না, ছাড়বে কি! যূথিকা যাবে না ? ও অমনি ছেড়ে দেবে ?

হ্যাঁ, যূথিকাও উঠল। জয়া ওঠবার পরেই যূথিকা। যূথিকা বসল মাঝখানে, বিভাস আর জয়াকে বিভক্ত করে।

উনি ড্রাইভারের পাশে বসলেন না কেন মেয়েদের একলা ছেড়ে দিয়ে ?

ও! ড্রাইভারের পাশে চাকর বসেছিল।

হ্যাঁ, জয়াকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল বাজার করতে। বলে গেল, কাল যাব তোমাদের বাড়ি। কই, না করল না তো!

না, গাড়িতে কিছু হয় নি।

তবে, বাড়িতে? বাড়িতেই বা সময় কতটুক? তেমন ফাঁক কোথায়? কোথায় তেমন নিরিবিলি?

তবে কি কালকের আগের কোনও ঘটনা?

আগের ঘটনা হলে কাল ও যায় কেন? সারাক্ষণ কেন উল্লাস-বিলাসের ঢেউ তোলে? সোনার পাখা মেলে কেন ফুরফুর করে উড়ে বেড়ায়?

কই, কাল তো ছিল না এমন রুক্ষরোষের চেহারা। বরং ফুল্লমল্লিকার মুখ করে ছিল!

চা আর মিষ্টি নিয়ে এল মাসিমা।

তবু তাই নিয়ে বিভাসকে ব্যাপৃত রাখতে পেরে যূথিকা একটু নিশ্চিন্ত হল।

'কই, জয়া কোথায়, এত আমি খাব কি করে?' বলতে-বলতে জয়ার সন্ধানে এগুলো।

দু' পা দূরেই এক চিলতে রান্নাঘর। দেখল জয়া গুম হয়ে বসে আছে এককোণে।

'এই যে তুমি এখানে। আমি এত খাব কি! এস তুমিও একটু হাত লাগাও।'

উঠে দাঁড়াল জয়া। একবার একটু-বা দেখল সজাগ হয়ে পিছনে আর কেউ আছে কিনা। না, আর কেউ নেই। স্বস্তিতে হাসল জয়া। বললে, 'সামান্য জিনিস, এর আবার ভাগাভাগি কি।'

পীড়াপীড়ি করল না যূথিকা। একটু ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিগগেস করলে, 'শরীর কেমন আছে?'

'ভালো।'

'মন-মেজাজ?'

'ভালো নয়।'

'কেন কী হয়েছে?' স্বর নামিয়ে কাছে একটু টানতে চাইল যূথিকা।

'জানি না।' জয়া চোখ নিচু করল। পরে কী ভেবে মুখে একটু শীর্ণ হাসি টেনে বললে, 'মেজাজের কি কিছু ঠিক আছে?'

যূথিকা স্বর এবার গোপনের ঘরে নিয়ে এল। বললে, 'তখন জানলাটা আমাদের মুখের উপর অমন ছুঁড়ে মেরে বন্ধ করলে কেন?'

'আপনাদের মুখের উপর? কই, কখন?' ভিতরে-ভিতরে কাঁপতে লাগল জয়া। এর আবার মোকাবিলা হয় নাকি?

'সে কি, এই তো খানিক আগে। আমরা, আমি আর উনি, ওদিকের ঘরটায় বসে, আর তুমি মুখোমুখি ঘরটাতে দাঁড়িয়ে। জানলার পাল্লা তোমার দিকে। হঠাৎ তুমি তোমার দিক থেকে সজোরে ছুঁড়ে মারলে জানলাটা—'

একটু জোরে হাসতে চেষ্টা করল জয়া। বললে, 'শব্দ করে বন্ধ করলাম।'

'হ্যাঁ, তাই। তাই-বা কেন?'

'বাঃ, জানলার উপরে দেওয়ালে একটা টিকটিকি ছিল, সেটাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে।' হাসির ঢল নামাতে চাইল জয়া। কিন্তু কোথায় কোন কুণ্ঠা না কষ্টের পাথরে আটকে গেল জল।

যূথিকার মন খোলসা হল না।

দুজনে চলে যাচ্ছে, সুশীলবাবু আবার কেঁদে পড়লেন। 'যদি মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পার। তোমাদের কাছে আর নতুন কী বলব। পেনসন নিয়েছি, মাইনের আদ্ধেকের চেয়েও কম। শাঁসালো বড় ছেলেটা মারা গেল, ছোট দুটো সামান্য তেলে টিমটিম করছে। বাপ-মরা ভাইঝিটা ছিল মামাদের কাছে, মফঃস্বলে। দু-দুবার আই-এ ফেল করল, মা চোখ বুজল, মামারা সুযোগ বুঝে বললে, আর টানতে পারব না জের, বিয়ে দিয়ে দিন। এখানে, আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে। বিয়ে যেন হাতের মোয়া। চুড়োর উপরে ময়ুরপাখা—গায়ের রঙখানা তো দেখেছ। একটা কোথাও যদি তাই চাকরি জুটিয়ে দিতে পার। মেয়েও গোঁ

ধরেছে, চাকরি করবে, দাঁড়াবে নিজের পায়ে। ফেল-করার লজ্জা, অমনোনীত হবার লজ্জা, মুছে ফেলবে রোজগার দিয়ে। তোমরা দুজন আছ, তোমরা যদি কোথাও না ব্যবস্থা করে দাও—'

'স্টেনোগ্রাফি তো শিখছে।' বললে যূথিকা।

'তা শিখছে। কিন্তু কত দিনে তৈরি হবে, তা কে বলবে। শিখছে শিখুক, ততদিন সঙ্গে-সঙ্গে কিছু একটা চাকরি। ছোটখাটো, যেমন-তেমন—কোন আফিস-টাফিস—কত তো তোমাদের চেনা।'

'দেখি।' যূথিকা আবার এক-নজর দেখল জয়াকে।

রঙ কালো বটে, কিন্তু কেমন একটা আলো-আলো ভাব। যেন নতুন ধানের থোরে শরতের সোনা ভরা। সবুজ-সজীব।

কয়েক মাস পিচের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে শরীর একটু শুকনো-শুকনো হয়েছে কিন্তু টান-টান তাজা ভাবটা একটুও ঝিমিয়ে পড়ে নি। যে নীল-নীল আকাশভরা নরম রোদ এনেছিল গাঁ থেকে তার আভাস এখনও গায়ে মাখা আছে।

'দেখি, চেষ্টা ত করছি।' নতুন আশ্বাস দিল বিভাস।

'মেয়েদের চাকরি! শুনতেই সুন্দর, নইলে একশো গণ্ডা ঝামেলা।' যূথিকা বিরক্তির ঝাঁজ আনল গলায়ঃ 'ট্রামে-বাসে ওঠা মানে নরককুণ্ডে ঝাঁপ মারা। তারপর আফিস ত নয়, পশুশালা। অন্যমনস্ক হয়ে, একটু নিজের মনে বসে কাজ করবার জো আছে? তার পর একেকজন বস্ যা আছেন—'

'উপায় কি।' বললেন সুশীলবাবু, 'যুগের সঙ্গে চলতে হবে মানিয়ে। যেমন গলি তেমন চলি—'

বাড়ি ফিরে এসে স্বামীকে একলা পেয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল যূথিকাঃ 'মেয়েটা কি রকম বেয়াদব দেখেছ?'

কোন্ মেয়েটা জানবার দরকার নেই, তবু গোড়াতেই একেবারে লাফিয়ে ওঠা যায় না, তাই ঠাণ্ডা চোখে বিভাস বললে, 'কেন, কী করল?'

'ন্যাকামি করো না। ওই যে তখন আমাদের মুখের উপর বন্ধ করে দিল জানলা!'

'মেয়েরা কখন কী করবে, হাসবে না কাঁদবে, কেউ বলতে পারে খড়ি পেতে?'

'বলল কিনা, একটা টিকটিকি ছিল, তাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে।' চোখে চোখ রাখল যূথিকা: 'তুমি কি টিকটিকি?'

'বা, আমি টিকটিকি হতে যাব কেন?' আকাশপড়া ফ্যাকাশে মুখ করল বিভাস।

'তুমি ছাড়া আর কে। তোমাকে লক্ষ্য করেই ও জানলাটা ছুঁড়ে মেরেছে। তাতে আর সন্দেহ কি।' চোখের কোণে ক্রুদ্ধ শর পুরল যূথিকা: 'ওর সঙ্গে কোনও দুর্ব্যবহার করেছ?'

'তার মানে?' কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াবার মতন করে বললে বিভাস।

'তার মানে, কোন দুশ্চেষ্টা—'

'ও কিছু বলেছে?'

'জিগগেস করি নি এখনও।'

'জিগগেস করলেই পার।'

'নইলে ওর অত চটবার কারণ কি। বলা যায় না কখন কি খেয়ালের বশে কী করে ফেল আচমকা। সন্নেসী আছ, কি দেখে ফট্ করে হঠাৎ বিলাসী হয়ে ওঠ।'

'তোমার রাজত্বে বাস করে কি আর বিলাসী হবার জো আছে!' একটা ম্লান শ্বাস বেরিয়ে এল বিভাসের মুখ দিয়ে।

আলোতে কপালের কাছেকার দুটো পাকা চুল যেন আরও চকচক করে উঠেছে। যূথিকা কাছে গিয়ে চুল দুটো তুলে ফেলল। আর, একবার কটা তুললে আরও কটার জন্যে আঙুল নিসপিস করে।

সন্দেহ কি, স্বামীকে যূথিকা কড়া শাসনে সন্নেসী করে রেখেছে। নইলে আর শান্তিতে সংসার করতে হত না। যে জানলায় প্রতিবেশী

আছে সে জানলায় দাঁড়াতে পায় না। রাস্তায় বেরুলে ছাড়পত্র নেই কোনও চলন্ত দীপশিখার উপর দৃষ্টিটা স্থির করে। না, বিভাসের একটাও কোন মেয়ে-বন্ধু নেই। এমন কেউ নেই যার কাছে একটু শ্রীমান হয়ে বসতে পারে, নিজের কানে শোনে নি এমনি মোলায়েম সুরে বলতে পারে কথা। যা দু-একজন অনাত্মীয় আলাপী মেয়ে আছে, তাও ক্লাবের মেম্বর হয়ে, আর সেই ক্লাবে যূথিকাও তার সহযাত্রী। এমন কেউ নেই যে, কাগজে-কালিতে না হোক, রঙিন ভাষায় একটা আধটা চিঠি লেখে—তেমন যদি নাকের ডগায় গন্ধ লাগে, নিজেই চিঠির মোড়ক খুলে ফেলে যূথিকা। যদি তেমন কেউ বাড়িতে দেখা করতে আসে, যূথিকাই গায়ে পড়ে আগে থেকে তার ভার নেয়। আলাপের পরিধি-পরিমিতি তদারক করে। মোট কথা, সঙ্গে-রঙ্গে, প্রকাশ্যে-নেপথ্যে, অনৈক্যে-আধিক্যে, নিজেকেই সে করে রেখেছে একচ্ছত্রী। এই ত ভদ্র, প্রৌঢ় জীবনের নিয়ম-নিয়তি। নিজের কক্ষে সুষম ছন্দে এখন শুধু পাক-খাওয়া। যজ্ঞের ষাঁড় আর এখন হাল টানবে কি !

বিভাসের জীবন দেওয়াল দিয়ে নিরেট গেঁথে দিয়েছে যূথিকা, জানলা খুলে রাখে নি একটাও। গানের মধ্যে রাখে নি একটুও মিশ্ররাগের অবকাশ। তুমি এখন সাংখ্যের পুরুষের মত উদাসীন থাক আর আমি ধাত্রীভাবে দেখি-শুনি তোমাকে।

এই এখন শান্ত শালীন সুস্থ অবস্থান।

ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের মুখটার উপর হঠাৎ নজর পড়ল যূথিকার। মনে হল আগন্তুক কে এক মহিলা বিনানুমতিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। চমকে উঠবে কিনা ভাবছিল, কিন্তু না, এ ত সে নিজে। সে নিজে ? তা ছাড়া আর কে। বিভাসের জীবনের রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী। আনন্দের মূলসম্পদ।

মাথার চুল উঠে গিয়ে টাক-পড়ার মত হয়েছে। কটা দাঁত নড়তে-নড়তে এগিয়ে এসেছে মাড়ি ছেড়ে। গাল দুটো ভেঙে গিয়ে মুখে

মাংস ঝুলিয়ে দিয়েছে। থলে জাগছে চোখের কোলে। দেহের উপর-নিচে কোথাও আর নেই বৃত্তাভাস।

কিন্তু বিভাস পঞ্চাশ পেরোলেও এখনও কেমন ঋজু ও প্রশস্ত। বর্ণ ও বল, সুর ও ছন্দ, গতি ও যতি সমান প্রস্ফুট। কোথাও বিরূপ বক্রতা নেই, দৌর্বল্যশৈথিল্য নেই। তবু সব ফুরিয়ে-ফেলা নিঃস্বের মত বসে আছে—দেখাচ্ছে। চলে যাচ্ছে যাক এমনি স্পৃহাহীন স্বাদহীন তরঙ্গহীন স্রোতে গা ভাসিয়েছে। জীবনে গাঢ়তা ও গূঢ়তা যে রস দিতে পারে যূথিকার সঙ্গে আপোস করতে গিয়ে তাই যেন খুইয়ে এসেছে। শুধু শমিত নয়, স্তিমিত। রাত্রি যূথিকার কাছে একতাল কালো ঘুম, কিন্তু বিভাসের কাছে এখনও হয়তো রহস্য-হংসী। সে হাঁস আর বুঝি ডিম দেয় না।

কেমন ক্ষীণশ্বাস ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে বিভাসকে।

'যাই বল মেয়েটার কী স্পর্ধা, গুরুজন বলে একটুও মান্য নেই।' রাগে রি-রি করে উঠল যূথিকা।

'মেয়েদের মতিগতির মাথামুণ্ডু কিছু আছে নাকি ?' সহজে নিশ্বাস ফেলল বিভাস।

'সাদামাঠা মেয়ে, দুরবস্থার সংসারে এসে উঠেছিস--' আক্ষেপের সুরে বলতে লাগল যূথিকা: 'আমরা তোর মুরুব্বি, একটা সুরাহা কোথাও করতে পারি কি না তাই দেখছি, আর তুই কি না আমাদেরই মুখের উপর—'

'মেয়েদের রাস্তায় কোনও ট্রাফিক-লাইট নেই, লেফট-রাইট নেই। কখন গলবে কখন জ্বলবে, দেবতা দূরের কথা, দানবেও বলতে পারে না।'

গলতে-গলতে যূথিকাই হঠাৎ জ্বলে উঠল: 'কিন্তু, সত্যি বল না, কী হয়েছে!'

'বা, কিছু হলে তো বলব!'

'নইলে শুধু-শুধু জানলা ছোঁড়ে?' কটাক্ষ আবার সূক্ষ্ম করল যূথিকা।

'স্থলে-জলে-আকাশে কত কি ছুঁড়ছে মানুষে—চুপ করে যাও।' কাগজ তুলে নিল বিভাস। মুখ ঢাকলো।

মুখ ঢেকে চুপ করে থাকবার মেয়ে নয় যুথিকা। পরদিন সকাল-সকাল ফিরল আফিস থেকে। বাড়ি না গিয়ে গেল মাসিমাদের ওখানে।

জয়া শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল, তাকে নিয়ে এল নিভৃতিতে। দরজা বন্ধ করে দিল।

'কী হয়েছিল সত্যি করে আমাকে বল।'

জয়ার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

'হাঁ, আমার সব জানা দরকার। যদি কোথাও কিছু অন্যায় বা অসঙ্গত কিছু হয়ে থাকে তার সুষ্ঠু প্রতিকার করতেই হবে। তুমি কুমারী মেয়ে, কোনও বিপদের ঝুঁকি তুমি নিতে পার না।' বললে, 'আমার সংসারে কোনও ভাঙন ধরবে এ ভয় তুমি করো না। বরং বাড়তে-বাড়তে পাপ যদি প্রলয়ের মূর্তি ধরে, তখন দশ দিকের কোনও দিকই সামলানো যাবে না। তোমাকে বলছি, কাপড় দিয়ে আগুন ঢেকে রাখা যায় না, অধর্ম বা অন্যায় কিছুই গোপন করবার নয়।'

ঘেমে নেয়ে উঠল জয়া। যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ, বল, ভয় নেই।'

'কত দিনই তো গিয়েছি, সেদিনও গিয়েছিলাম আপনাদের বাড়ি, সন্ধ্যেবেলা, একলা—' বলতে লাগল জয়া, 'ছাদে রেলিঙ ধরে নিরালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম চুপচাপ—'

'আমি ছিলুম কোথায়?'

'বাথরুমে।'

'হ্যাঁ—তার পর?'

'উনি হঠাৎ পিছন থেকে এসে আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন।'

'উনি মানে—'

'বিভাসবাবু।'

'হ্যাঁ, দাঁড়ালেন—'

'হ্যাঁ, গা ঘেঁষে। আমার হাত ধরলেন। আর কানের কাছে মুখ এনে—'

'কি, চুমু খেলেন ?'

এত যন্ত্রণাতেও হাসল জয়া। বললে, 'না। অতদূর নয়। শুধু তাঁর নিশ্বাসটা গালের উপর পড়ল।'

'শুধু নিশ্বাসটা ?'

'হ্যাঁ, আর বললেন, তুমি ভারি মিষ্টি মেয়ে। তোমাকে খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করে। তোমার কখনও করবে আমাকে ? কি, করবে ?'

'তা তুমি কী বললে ?'

'আমি একটা ঝটকা মেরে তাঁর হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বললাম, ছিঃ, আপনি সম্ভ্রান্ত বিবাহিত পুরুষ, এ আপনার কী ব্যবহার! পালিয়ে চলে গেলাম ঘরের মধ্যে।'

যূথিকার মুখে কথা নেই। তাকে চুপ করে যেতে দেখে ভয় পেল জয়া। ব্যাকুল হয়ে বললে, 'বলে খুব অন্যায় করলাম। তাই না ? কী দরকার ছিল বলবার! আপনি এত পীড়াপীড়ি করছিলেন—'

'না, বলে ভাল করেছ। শোন—' যূথিকা অভিভাবিকার সুরে বললে, 'তুমি আর আমাদের বাড়ি যেয়ো না।'

'যাব না।' মুখ নিচু করল জয়া।

'আর ওঁকেও বারণ করে দেব যেন এ বাড়ি না আসেন।'

'উনি আর আসেন কই ?'

'বলা যায় না। দগ্ধ মাঠ হয়ে গিয়েছেন তো, একটা সবুজ ঘাসের ডগার জন্যে আঁকুপাঁকু করছেন—'

'বেশ তো বারণ করে দেবেন।' পরে আকুল মিনতিমাখা সুরে বললে, 'কিন্তু আমাকে যা-হোক একটা চাকরি জুটিয়ে দিন, যূথিকাদি। একটা চাকরি পেলেই আমি বেঁচে যাই, ছাড়া পেয়ে যাই—'

'দেখি।' গম্ভীরমুখে যূথিকা বললে, 'আমাদের ড্রাফটিং ডিপার্ট-

মেণ্টে ক-জন কপিস্ট নেবে। তুমি একটা দরখাস্ত করে দিয়ো। কপিংয়ের কাজ করতে পারবে নিশ্চয়—'

'খুব পারব।' উৎসাহে নেচে উঠল জয়া। 'তার পর চাকরি করতে করতে স্টেনোগ্রাফিটা পাস করে নিতে পারলে—'

'তখন তো লেডি-টাইপিস্ট, খোদ বস্‌-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি—'

কি বুঝল কে জানে, হাসল জয়া।

চাকরি জোগাড় করে আনল যূথিকা। গোড়ায় মাইনে কম, তা হোক—এই দেখ অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার। পড়েও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না জয়া। ছোটখাট একটা ইণ্টারভিয়ুও হল না? কপিস্টের আবার ইণ্টারভিয়ু! দরখাস্তের হাতের লেখা দেখেই নির্বাচন। সস্ত্রীক সুশীলবাবু আশীর্বাদ করতে লাগলেন যূথিকাকে। জয়া সমস্ত শরীরে মুক্তির নিশ্বাস ফেলল।

এর আর ইণ্টারভিয়ু হয় না। ডিপার্টমেণ্টের বস্‌-এর সঙ্গে দেখা করে ডিউটি বুঝে নিয়ে কাজে লেগে গেলেই হল।

'আপনি নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।' আবদেরে গলায় বললে জয়া।

'হ্যাঁ, আমিই তো নিয়ে যাব। আর শোন', একটু ঘন হল যূথিকা: 'বেশ ছিমছাম ফিটফাট থাকবে। ঝিকমিক ঝিকমিক করবে। চট করে বস্‌-এর যাতে সুনজরে পড়ে যাও। যস্মিন দেশে যদাচারঃ। যেমন রেওয়াজ তেমনি আওয়াজ। চাকরি করতে আসাই উন্নতির জন্যে। আর উন্নতি মানেই উপরওয়ালার নেকনজর।'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ, সাধ্যমত। এ সব অফিসের এটিকেটই অন্যরকম। বস্‌-এর সঙ্গে ফ্রেণ্ডলি হওয়া দরকার।'

'ফ্রেণ্ডলি?' ভুরু কুঁচকাল জয়া।

'হ্যাঁ, হয়ত একটু মোটরে করে বেড়ানো, বাইরে কোথাও একটু খাওয়া, সিনেমা দেখা, কেনাকাটা করা, ছোটখাট প্রেজেণ্ট নেওয়া—এই একটু সাহচর্য, একটু বা প্রেম-প্রেম খেলা—'

'এই বুঝি রীতি ?'

'হ্যাঁ, যেমন ব্রতে যেমন কথা। তা না হলে দেখবে নিচের লোক প্রমোশন পেয়ে গেছে আর তুমি পিছনে পড়ে আছ।'

'আপনাকেও অমনি করতে হয়েছে উন্নতির জন্যে ?' দ্বিধা করল না জয়া।

'নিশ্চয়। এবং আমার পক্ষে কিঞ্চিৎ হয়তো বেশি। পুরুষ মানেই ক্লান্ত, অপূর্ণ, বাড়ির বাইরে একটু বাগান চায়, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে একটু বা চুটকি রচনা। ঠিক উড়তে না চাইলেও হয়তো বা একটু ফুরফুর করতে চায়। তারই জন্যে এক চিলতে আকাশ হওয়া, একফালি মাঠ হওয়া—'

'বুঝেছি।' অচঞ্চল চোখে বললে জয়া। 'দরকার হলে শিখে নেব, জেনে নেব আপনার কাছে।'

'এ আর শেখবার-জানবার কি। মানে আর কিছু নয়, চালাক হওয়া। ইংরিজীতে যাকে বলে ট্যাক্টফুল হওয়া। বিতরণ নয়, একটু বিকিরণ করা। আঁটসাঁট কঞ্জুস সংস্কারগুলো একটু ঢিলে করে দেওয়া।' যেন মাস্টার উপদেশ দিচ্ছে এমনি ভাব যূথিকার: 'জল একটু ছুঁক ক্ষতি নেই, মাছ ধরতে না চাইলেই হল—'

চালাক-চালাক চোখে তাকাল জয়া। বললে, 'কিন্তু যদি মাছ ধরবার জন্যে হাত বাড়ায় ?'

'তোমার জানলা নেই ? পেপার-ওয়েট নেই ? হাতের কব্জি নেই ? আর আমি ? আমি নেই ?'

শব্দ করে হেসে উঠল জয়া।

'নিজে সাবধান থাকলেই জগৎ সাবধান। তারই মধ্যে যদি হালকা কটা তুলির টানে একটা মরা রঙকে জাগিয়ে দিতে পারি তো মন্দ কি।'

এখানে লিফট ওখানে সিঁড়ি, ঘরে-বারান্দায় প্রকাণ্ড অফিস। জয়াকে সাজিয়েগুজিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেল যূথিকা। এখানে-ওখানে

কয়েকটা মেয়ে বসেছে কাজ করতে। মাত্রার উপরে রেফের মত দু-একটা বা হাঁটছে বারান্দায়।

ডিপার্টমেন্টের বস্-এর অফিসরুমের বাইরে দাঁড়াল দুজন। জয়ার বুক দুরদুর করতে লাগল।

যূথিকা বললে, 'ভয় কি। ঢুকে পড়। একটু মিষ্টি হেসে নিজেকে ইন্ট্রডিউস কর, তার পর কি ডিউটি আজ এসাইন করলেন জেনে নাও। যদি একটু বা আলাপ করতে চান একটু অপেক্ষা করো।'

সাহসে ভর করে ঢুকে পড়ল জয়া।

'বোস।' বিভাস বললে।

জয়া ধুলোপড়া সাপের মত স্থির হয়ে রইল খানিকক্ষণ। পরে বসল আচ্ছন্নের মত। একপাশে মুখ ফিরিয়ে রাখল।

'গোড়ায় এই কটা চিঠি নকল করতে হবে। পর-পর সাজান আছে ফাইলে। হালকা কাজ। হ্যাঁ, শুরুতেই আগে জিগগেস করে নি।' মুখ তুলে পষ্টাপষ্টি তাকাল বিভাস: 'কি, কাজ করবে তো এখানে?'

যে রাত্রি, সেই আবার মুখ ফিরিয়ে—দিন।

মুখ ফেরালো জয়া। হাসিমুখে বললে, 'করব।'

॥ রাতের মত রাত ॥

সভার মাঝখানেই খাতা এল। এই রেওয়াজ। যারা যারা সভায় উপস্থিত হয়েছে তাদের স্বাক্ষর চাই। কে আসছে যাচ্ছে একটা রেকর্ড থাকা মন্দ কি।

যারা ক্লাবের মেম্বার নয় তাদেরও কি সই করতে হবে?

করুন না। যদি সইয়ের খাতিরে সভ্য হন কোনদিন।

মেম্বার নয় এমন কেউ এসেছে নাকি সভাতে?

মনে হচ্ছে এসেছে। চারদিকে এক নজর তাকালেই বোধ হয় বোঝা যায়।

কেন আসবে না? আজকে বিশেষ সভা। সর্বসাধারণের নিমন্ত্রণ। আজকে বিনায়ক বোসকে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে।

তাই বলে এমন ঢালাও লোক হয় নি যে খাতার মধ্যে ধরবে না। হল্‌ঘরটা ভাসা-ভাসা ভরে খানিকটা বারান্দায় ছিটকে এসেছে মাত্র। গান শুরু হলে পথচলতি লোক কেউ দাঁড়াতে পারে বাইরে।

খাতাটা প্রথমে বিনায়কের দিকেই এগিয়ে দেওয়া হল।

এতেও বিনায়কের রাগ। খাতাটা ঠেলে দিয়ে রুক্ষস্বরে বললে, 'আমি নাম সই করব সকলের শেষে।'

সভার কাজ চলতে লাগল, সঙ্গে-সঙ্গে সকলম খাতা ফিরতে লাগল হাতে-হাতে। যে যার নাম লিখতে লাগল পর-পর।

'ঠিকানাও দিতে হবে?' কে এক আগন্তুক জিগ্‌গেস করলো।

'না, না, ঠিকানা কেন? ঠিকানা লাগবে না।' কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কে একজন মাতব্বরি করে উঠলো।

নামের ক্রমিক সংখ্যা রাখা হচ্ছে না। এখানে বসে দেখাও যাচ্ছে না, কে কি লিখছে। তবু লক্ষ্য রেখেছে বিনায়ক। কোন্ পৃষ্ঠায় কোথায় কার পরে বা আগে সই করে মেয়েটি।

অনেককেই প্রায় চেনে বিনায়ক। যে কজন অচেনা তার মধ্যে মেয়েটি স্বতন্ত্র। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ নেই, কাঁধে ঝুলছে একটা কাপড়ের থলে।

বারেবারেই তাকাচ্ছে বিনায়কের দিকে। স্পষ্ট চোখ রাখছে চোখের উপর। খাড়া রোদের নিচে অতল কালো দিঘি। অনুগ্রহের চোখ নয় ঔৎসুক্যের চোখ। অনুকম্পার নয় প্রশংসার।

কই কোনও দিন দেখি নি তো। ঘুণাক্ষরেও তো পাই নি কোনও খবর।

ঘুণাক্ষরের মতই সূক্ষ্ম করলো চোখ। চশমার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টিটাকে একটু বাঁকা করার ব্যায়াম করলো। মেয়েটির সিঁথিটা সাদা, চিরুনির লালচে ডগাটা ছোঁয় নি এখনও। মেয়েটি নিঝ ঞ্ঝাট।

খাতা ঘুরে আসতে বিনায়ক আরও দেখলো মেয়েটির নাম রুচিরা। রুচিরা সেন।

'আপনার নাম বুঝি রুচিরা সেন? সভার শেষে হল্ থেকে বেরিয়ে এসে সূক্ষ্মভাবে পা ফেলে-ফেলে লাগ ধরেছে বিনায়ক।

'কী আশ্চর্য, কি করে জানলেন?' রুচিরা কৃতার্থের মত বললে।

'আমরা কবি, আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। যাকে বলে অতীন্দ্রিয়। তাইতেই বুঝতে পারি।' হাসি নেই তবু হাসবার চেষ্টা করল বিনায়ক।

যেন এটা অসম্ভব নয় এমনি গদগদ চোখ করে তাকালো রুচিরা।

সংবর্ধনার উত্তরে যেমন চোখা-চোখা কথা বলেছে বিনায়ক, ভেবেছিল ফিরতি মোটর দেবে না কর্তারা। না দেয় না দেবে, পায়ে হেঁটেই চলে যাব। অনবরতই তো হাঁটছি দিনরাত। জেগে থাকার শেষ খুঁজছি।

বিনায়কের রাগ সংবর্ধনায় নয়, সংবর্ধনার কাণ্ডজ্ঞানে। শুধু একটা কলম দিয়েছে। যেন লেখবার একটা কলম জোগাড় হয় নি এতদিন। ও-রকমই যদি দিতে হয়, সোনার দোয়াত-কলম দে। তা হলেই কিছু উপশম হতো। ভেবেছিল, অল্প-স্বল্প হোক, টাকার থলে একটা দেবে। কিংবা কিছু তার বই হাতে-হাতে বিক্রি করিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করবে সরজমিনে। না হয় স্বহস্তে সই করে দিত সব বই। তাছাড়া, সভান্তে সকলকে ডিশ খাওয়াবার দরকার কী ছিল! এযাত্রা শুধু একজনকে খাওয়ানোই তো উচিত ছিল পুরোপুরি।

এ সব কথা বলেছে বিনায়ক এবং সবিস্তারে। ভদ্র আহার নেই, বাসস্থান নেই, উপার্জন নেই, সর্বোপরি রোগে চিকিৎসা নেই, ঘুম নেই—তার পক্ষে কাগজে বা কলমে সংবর্ধনায় কী হবে?

না, ট্যাক্সি এনেছে একটা।

ভাবতে পারে নি বিনায়ক, দরজার কাছ পর্যন্ত এসেছে রুচিরা।

আপনি থাকেন কোথায়, কোনদিকে যাবেন, এমনি একটা প্রশ্ন মুখে এসে পড়েছিল বিনায়কের, সামলে নিল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অধিকারীর পক্ষে এ প্রশ্ন মানায় না বোধ হয়।

কিন্তু রুচিরা সহসা একটা ছোট খাতা আর কলম বের করলো।

অটোগ্রাফ নেবে বুঝি? রুচিরার মত ভারিক্কী মেয়েও এমন একটা লঘুতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে ভাবা যেত না। যদি সই করে পাওয়া যেত একটা ফি, বুঝতাম সইয়ের কিছু দাম আছে। চাবুক মারা কি একটা নৃশংস কথা লিখবে, চট করে ঠিক করে ফেললো বিনায়ক।

কিন্তু খাতা আর কলম ছাড়লো না রুচিরা। বললে, 'দয়া করে আপনার ঠিকানাটা একটু বলবেন?' আর কবিকে বলছে বলেই একটু কাব্য করল: 'আমরা তো আর অতীন্দ্রিয় নই যে, সব জানা হয়ে থাকবে।'

হাসি-হাসি সাহসে মাখা মুখ। স্বাস্থ্যে শ্রীতে মরা নদী নয়, ভরা

গাও। একটু বেশ মন দিয়ে তাকালো বিনায়ক। কিন্তু শুধু দেখবার নয়, কিছু বুঝি আছেও শোনবার। গলার স্বরে প্রথমে মমতা, শেষে একটু বা আত্মীয়তার ছোঁয়া।

ঠিকানা নিয়ে কী করবেন জিগ্‌গেস করল না বিনায়ক। ঠিকানাটা দিল। লিখে নিল রুচিরা।

বিনায়ক ভেবেছিল হয়তো নিজের লেখা বই-টই কিছু আছে তাই পাঠাবে। অভিমত নামে প্রশংসাপত্র চাইবে। কিংবা কারু বিয়ের উপহারের বইয়ে, যেমন রেওয়াজ হয়েছে, কবিতার কটা ছত্র। কিংবা, এটা [illegible], লিখে পাঠাবে একটা আনন্দের চিঠি।

তার দুই চোখে আনন্দের চিঠি কি সেদিন লেখে নি রুচিরা?

আর, তাই কি সংবর্ধনা নয়?

দুরাশার চেয়েও বেশি, সেদিন সকালে স্বয়ং রুচিরা এসে হাজির সশরীরে।

'এ কি, এ আপনি করেছেন কি! এসেছেন কোথায়?' ঘরের মধ্যে মেঝের উপর একটা গুটানো চটের এক প্রান্তে বসে বিড়ি ফুঁকছিল বিনায়ক, প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো।

ঠিকানাটা একটা বস্তি, গোড়ায় ঢুকতে যেতেই ভড়কে গিয়েছিল রুচিরা, কিন্তু পাড়াটা ভদ্র, সময়টা সকাল, সেই ধারণার থেকেই সাহসে শিথিল হয় নি। কিন্তু এখন বিনায়কের গর্জন শুনে মনে হল কোন এক জুয়াড়ীর আড্ডায় না খুনে-গুণ্ডার আস্তানায় বা তারও চেয়ে অধমতর জায়গায় বুঝি এসে পড়েছে।

তার চেয়েও ভয়াবহ। বিনায়ক বুঝিয়ে বললে। এখানে দিন হলেও অন্ধকার, বৃষ্টি না হলেও কাদা, নিদারুণ জ্যৈষ্ঠেও শীত আর শত অভাবে অনটনে অনশনেও অমৃত্যু।

'আপনি এখানে আসবেন কেন?'

'বা, আপনাকে দেখতে। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে।' রুচিরা ঝলমল করতে লাগল: 'জানেন, আমার কতদিনের স্বপ্ন—'

'ওগো শুনছ—' অনুপস্থিত কার উদ্দেশে হাঁক পাড়লো বিনায়ক।

'আপনার স্ত্রীকে ডাকছেন?'

'হ্যাঁ—'

'কোথায় তিনি?' এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো রুচিরা।

'কান্নাঘরে।'

'কান্নাঘরে?'

'হ্যাঁ, রান্নাঘরই তার কান্নাঘর।'

অত লম্বা হাঁক দেবার দরকার ছিল না, কাছেই, বারান্দার খানিকটা ঘিরেই রান্নার জায়গা। হাড়পাঁজরের এক স্তব্ধ [illegible] কাছে এসে দাঁড়ালো।

রুখে উঠলো বিনায়ক: 'বসতে একটা আসন-টাসন দেবে তো?'

মুখে রাগও নেই কৌতূহলও নেই, ঈর্ষা বিরক্তি বেদনা কিছু নেই— গুটোনো চটটা মেলে দিয়ে চলে গেল অন্তরালে।

নিঃসংকোচে বসল রুচিরা।

চটটা ছোট, ব্যবধান তাই সংক্ষেপ।

'কবির কাছে কেউ আসে?' আক্ষেপ নয়, প্রায় ধমকের সুরে বললে বিনায়ক। 'আমি যদি গায়ক হতাম, আসতেন, মানাতো। আর, গায়ক হতে পারলে এমনিতরো থাকতাম নাকি? গায়ক কেন, শুধু সিনেমার গানলেখক—'

সামাজিক সমস্ত মূল্যবোধের রীতিনীতির উপর খড়্গ ঝাড়বে নাকি এক মুহূর্ত চিন্তা করলো বিনায়ক। আবার ভাবলো তার মুখে কি সব সময় বিষ ঝরবে, আগুন বেরুবে, একটু কি আনন্দের কথা ফুটবে না? একটু বা আশীর্বাদের সুর? রোদের ফালির মত এক টুকরো আশ্চর্য এই যে এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে এতে কি কোনও আনন্দ, কোনও আশীর্বাদ নেই? এততেও কি সে একটু চঞ্চল হবে না? আজও শুধু নালিশ করবে, শূন্যে হাত-পা ছুঁড়বে? বাতাসের সঙ্গে লড়াই করবে?

'জানেন, আপনি আমার সবচেয়ে প্রিয় কবি, আপনার কত কবিতা আমার মুখস্ত— ' বলেই রুচিরা এখান থেকে ওখান থেকে টুকরো-টাকরা আবৃত্তি করতে লাগলো।

কত অদ্ভুত লাগবার কথা, তার কবিতাও মুখস্থ হয়, এবং একজন তা শুনিয়ে যায় কাছে বসে। কিন্তু সব-তাতেই বিনায়কের অধৈর্য। থামিয়ে বললে, 'কিন্তু কবিতায় কি পেট ভরবে? চোখে ঘুম আনবে?'

'ঘুম?' চমকে চোখের দিকে তাকালো রুচিরা।

'জানেন কতদিন ধরে এক ফোঁটা ঘুমোতে পারি না। না দিনে না রাত্রে। না শীতে না বর্ষায়। একটা জীবন্ত আত্মহত্যার মত পথে-পথে ঘুরে বেড়াই। আর সব কিছু নেই সহ্য হয় কিন্তু ঘুম নেই এ এক জাগ্রত উন্মত্ততা।' দু চোখ বুন্ধ করলো বিনায়ক: 'তবু, আশ্চর্য, এখনও বদ্ধ পাগল হয়ে যাই নি, এখনও কবিতা লিখি।'

'চিকিৎসা করাতে পারেন না?'

যেন প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ রুচিরা নিজে, এমনিভাবে গর্জন করে উঠল বিনায়ক: 'চিকিৎসা? চিকিৎসা করব তার রেস্ত কই? ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা কই? ওই তো দেখলেন একটা কলম দিল শুধু।'

ঠোঙায় করে মুড়ি-ফুলুরি নিয়ে এসেছে দুটো ছেলে, পরের দুটো অপেক্ষা করছে বারান্দায়। ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে চতুষ্টয়ের মারামারি শুরু হয়েছে। আর ওদের মা একটা চেলা কাঠ দিয়ে নীরবে তার মীমাংসা করছেন।

'শুনুন আমার দিবারাত্রের কাব্য।'

আরও শুনলো। আরও দুটো আছে উপরে। বড়টা একটা কারখানায় কাজ করতো, কাঁচির মুখে পড়ে ছাঁট হয়ে গিয়েছে। আর মেজটা ফ্যা ফ্যা করছে রকে-ফুটপাতে।

'তবে চলে কি করে?'

'চলে? একে চলা বলে না, একে বলে ঝোলা।'

তারপরেই উদ্গীরণ। অগ্নিস্রাব। ভাগ্যের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে। লেখক-পাঠক-প্রকাশক-সম্পাদক-পরিচালক—জগৎ সংসারের বিরুদ্ধে। একটা সর্বসাকল্য বজ্রনাদ। কোটরে-ঢোকা উগ্র তুটো চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। শীর্ণ হাত বারে বারে কাঁপছে উত্তেজনায়। পারলে যেন এখুনি একটা বর্শা বা বন্দুক নিয়ে তেড়ে যায়।

'কতদিন ঘুম নেই?' ভয়ে-ভয়ে জিগ্‌গেস করলো রুচিরা।

'বোধ হয় আজন্ম। কবে ঘুমিয়েছি মনে করতে পারছি না। মনে হয় যখন মরবো, যদি মরি, তখনও আমি জেগে থাকবো, তখনও আমার তু চোখের পাতা একত্র হবে না।' একটু থামলো বিনায়ক। বললে, 'আপনার প্রিয় কবিকে দেখতে এসেছেন, দেখুন এক অনিদ্রিত কবি। আমার সমস্ত কবিতাই এক জ্বলন্ত অনিদ্রা। কি করে যে আপনি এখনও এখানে বসে আছেন ভেবে পাচ্ছি না।'

মাটির দিকে চোখ রেখে রুচিরা বললে, 'আমি ভাবছি আমি কী করতে পারি।'

'কী করতে পারেন?' খুঁটিয়ে আবার একটু দেখল বিনায়ক। মেয়েটার কেমন একটা চাকুরে-চাকুরে ভাব। রোদে-বাতাসে খোলায়-মেলায় ঘোরা। 'কী করেন আপনি?'

'তেমন কিছু নয়। তবে পুনর্বাসনে বা পুনরুদ্ধারে আমার আগ্রহ।' নিজের কানেই রুচিরার কথা তুটো কেমন খটমট শোনালো। একটু হেসে নিয়ে বললে, 'ভাবছি আপনার কোনও স্থায়ী উপকার করা যায় কিনা।'

জানতেও চাইলো না কী সে উপকার। উপহাসের তুলিতে অবিশ্বাসের রেখা ফোটালো বিনায়ক। বললে, 'আর কিছু নয়, আমার ঘুমের পুনরুদ্ধার করতে পারেন?'

'দেখি।' উঠে পড়লো রুচিরা।

শুধু ঘুমের নয়, আদর্শের। রুচিরার মনে হচ্ছিল এত যার শক্তি

কি করে সে চিৎকারেই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। শুধু নালিশ আর গর্জন। শুধু বিদ্বেষকলুষ। ব্যাস-বাল্মীকির বদলে শুধু দুর্বাশা। অন্তরে কোথাও যদি শান্তি না থাকে স্নেহ না থাকে তাহলে প্রত্যয় প্রসাদ পায় কি করে, কি করে কবিতার জন্ম হয়! আর কি করেই বা শান্তি স্নেহ আসে যদি না ঘুমোতে পারে এক তিল!

তার প্রিয় কবি আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে এই তো রুচিরার দুঃখ।

'দেখবার কিছু নেই।' বিনায়ক নিষ্ঠুরের মত বললে।

না, সব সময়েই কিছু বুঝি থাকে। সব দেখেও দেখা শেষ হয় না। চলে যাবার পরেও রেখে যায় একটু আবার-দেখবার তৃষ্ণা।

'কি করছেন?' হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো রুচিরা।

সেই একই চটাসনে বসে বিড়ি ফুঁকছে বিনায়ক। 'বসে আছি।' নির্লিপ্তের মত মুখ করে বললে। আরেকজনকে যে বসতে বলতে হয় তারও খেয়াল করলে না।

রুচিরারও বসবার মত ভাব নেই। কি যেন সে একটা পেয়েছে। তাই সে যেন আজ একটু দ্রুত ও দৃঢ়। বললে, 'বসে যে আছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কী করছেন বসে?'

'স্বপ্ন দেখছি।'

'আপনি স্বপ্ন দেখেন নাকি?'

'দেখি। ঘুমের স্বপ্ন।' পোড়া বিড়ির ছাইয়ের মতই চোখ করল বিনায়ক।

'উঠুন। আমার সঙ্গে। ডাক্তার দেখাবেন চলুন—'

'ডাক্তার? ডাক্তার পাব কোথায়?'

'চলুন। আমার চেনা—' কোমর বেঁধে এসেছে রুচিরা।

'আপনার চেনা, কিন্তু আমি ফি দেব কোত্থেকে?' বিনায়ক হাঁসফাঁস করতে লাগল।

'ফি লাগবে না।'

'লাগবে না, কিন্তু ওষুধ? বারো হাত গরু তার তেরো হাত শিঙ।'

'সে দেখব কি ব্যবস্থা করা যায়। চলুন, একটা একটানা চিকিৎসা না হলে কি ইনসমনিয়া সারে?'

উপেক্ষা করতে দিল না। প্রায় টেনে নিয়ে গেল। বাসে-ট্রামে করে একেবারে ডাক্তারের চেম্বারে।

বাড়ির সঙ্গেই ডাক্তারের ডিসপেনসারি। ফলকে-ঝলকে, দেওয়ালের ফলকে আর পোশাকের ঝলকে বেশ তেজী ডাক্তার।

চেনা যখন, বিনায়ক ভেবেছিল, রুচিরাকে দেখে ডাক্তার বুঝি উচ্ছ্বসিত হবে। কিন্তু, উলটো, ডাক্তার হঠাৎ আড়ষ্ট কাঠ হয়ে গেল। ক্রুদ্ধ কৌতূহলের দৃষ্টি বুলোল আপদমস্তক। মানে, তোমাকে বেশ চিনি, চিনতে আর বাকি কি, শেষ পর্যন্ত এই লোকটাকে জোগাড় করেছ। সন্দেহের সেই ক্লিন্ন চোখ থেকে বিনায়কও রেহাই পেল না। এই একটা আধমরা আধবুড়ো ভবঘুরে!

কিন্তু রুচিরা একটুকু দমলো না, এতটুকু কাঁপলো না। সরল সাহসে বললে, 'ইনি বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক বিনায়ক বোস। ক-বছর ভুগছেন ইনসমনিয়ায়, দিনে-রাতে একটানা ঘুম হচ্ছে না কখনও। এঁর দুর্দিন সাহিত্যের দুর্দিন। এঁকে যদি একটু দেখেন—'

'এখানে কেন?' রাগ-রাগ মুখে সুব্রত বললে, 'আর কারু কাছে যান।'

'আর কার কাছে যাব!'

'আরও ঢের ডাক্তার আছে শহরে।'

'কিন্তু এসব অসুখে আপনিই শুনেছি এক্সপার্ট। আপনার পরেই ওঁর বেশি ফেথ।'

বিনায়কের দিকে আরেকবার তাকালো সুব্রত। সত্যিই অসুস্থ, পরিক্লান্ত। প্রাথমিক কাঠিন্যটা তরল হয়ে এল একটু। জিগ্‌গেস করলে, 'কেউ হন আপনার?'

রুচিরা দ্বিধা করলো না। বললে, 'হ্যাঁ, আত্মীয় হন। তার চেয়ে বেশি, গুরু হন।'

সত্যিই চিকিৎসার স্পৃহণীয় বিষয়। এগিয়ে এল সুব্রত। পুঙ্খ-পুঙ্খ করে দেখলো বিনায়ককে। ওষুধ লিখে দিল। দিল আনুসঙ্গিক পরামর্শ।

'বাঙলা দেশের কবি, কিছুই সংস্থান নেই—' গলার স্বর কেঁপে উঠলো রুচিরার।

'চলে কি করে?' যেন এটাও একটা রোগের তথ্য এমনি যান্ত্রিক ঔদাসীন্যে প্রশ্ন করলো সুব্রত।

'এটা-ওটা লিখে। এখানে-ওখানে হাত পেতে। উঞ্ছবৃত্তি করে। তার মানেই, চলে না।' মুখ তুললো রুচিরা, 'তার জন্যেই তো আপনার কাছে আসা। যদি আপনার ফি-টা ছেড়ে দেন।'

ভীষণ বিরক্ত হল সুব্রত। দাঁড়িয়েছিল, মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল অন্যদিকে।

'কিন্তু ওষুধের দাম কত?' থলের মধ্যে হাত ঢোকালো রুচিরা: 'ওষুধের দামটা দিচ্ছি—'

ফিরে দাঁড়ালো সুব্রত। ক্রুদ্ধ ঘৃণায় বললে, 'যান। দিতে হবে না।'

রুগী আর তার সঙ্গিনী চলে যাচ্ছে, সুব্রত ডাকলো পিছন থেকে। বিনায়ককে লক্ষ্য করে বললে, 'শুনুন—'

ধমক-টমক দেবে বোধ হয়। নয়তো বা গালাগালি করবে। ভয় দেখাবে। কি জানি কি, থামলো দুজনে।

'শুনুন,' বললে সুব্রত, 'ওষুধের ঘুম কোনও কাজের ঘুম নয়। স্বাভাবিক ঘুম চাই। সে ঘুম হবে ডায়েটিং-এ আর চেঞ্জে—পথ্যে আর পরিবেশের বদলে। খাওয়া-দাওয়া বদলান আর স্থান বা পরিবেশ বদলান।'

ডাক্তারের সেই পিচ্ছিল দৃষ্টিটা এখনও যেন রুচিরার সঙ্গে লেগে আছে এমনি মনে হল বিনায়কের। বাইরে বেরিয়ে এসে জিগ্‌গেস করলে, 'কোথায় থাকেন?'

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বরাত দিয়ে লাভ নেই, ঠিকানা বললে রুচিরা।

'বিচিত্র নম্বর তো।'

'ও একটা মস্ত ফ্ল্যাট-বাড়ি। এক রুমের সব টেনাণ্টি। আমি একটা কর্নার-রুম পেয়ে গেছি। কর্নারের দিকে হলে দুখানা ঘর।' রুচিরা একটু থামল, পরে বললে, 'এই কাছেই। বেশি দূরে নয়।'

কিন্তু বিনায়কের অন্য প্রশ্ন: 'কে কে থাকে আপনার ফ্ল্যাটে?'

'কে আবার! আমি একা।'

'একা?' চলতে-চলতে পদক্ষেপটা ছোট করে ফেললো বিনায়ক।

'একা মানে পাশের ঘরে বাচ্চা চাকর একটা শোয়।' রুচিরা প্রাঞ্জল হবার চেষ্টা করলো।

'ভয় করে না?'

রুচিরা হাসলো। চলতে-চলতে বললে, 'কিসের ভয়? ওয়ার্কার মেয়ে, আমাদের আবার ভয় কিসের?'

ডাক্তারের সেই সরীসৃপ দৃষ্টি এখনও যেন হাঁটছে রুচিরার গা বেয়ে।

আধমরা! আধবুড়ো! বাড়ি ফিরে গিয়ে ভাঙা আয়নার টুকরোয় মুখ দেখবে বিনায়ক। কিন্তু, যাই বল, নিজের মুখে গুরু বলেছে। গুরু মানেই তো ভক্তির পাত্র। আর ভক্তি মানেই তো চিত্তের তন্ময়তা। চিত্তের তন্ময়তা মানেই তো সমস্ত বৈধতার বিসর্জন।

'চলুন আমার বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দেবেন?' হঠাৎ বলে বসলো রুচিরা।

'মন্দ কি। দেখে আসি।' আবার পদক্ষেপ ছোট করলে বিনায়ক: 'কোন্ তলায় আপনার ফ্ল্যাট—উঠতে পারব তো?'

'পারবেন। দোতলায় উঠবেন আস্তে-আস্তে।'

যৎসামান্য আসবাবে সাজানো ছোট দুখানি ঘর। এ-পাশেরটা বসবার ও-পাশেরটা শোবার। রান্নাঘর বাথরুম লাগোয়া। আর এই এক চিলতে প্যাসেজ।

হাঁটতে হাঁটতে শোবার ঘরে চলে এল বিনায়ক। কি আশ্চর্য

খোলা পশ্চিম আর দক্ষিণের খানিকটা। বিকেলের অঢেল হাওয়ায় উড়ছে পর্দাগুলো, খাটের উপরে তোলা মশারির খানিকটা। অস্ত যাবার সময়েও যে সুন্দর হওয়া যায় সোনালী অক্ষরে তাই লেখা হচ্ছে আকাশে।

'বা, চমৎকার!' বলে উঠলো বিনায়ক।

মনে হল ঘুম কত সহজ! কত অনায়াসেই না জানি পারে সে ঘুমিয়ে পড়তে।

'দেখুন, কত কবিতার বই আমার ঘরে।' আনন্দের লহর তুললে রুচিরা: 'স্ট্যাম্প-অটোগ্রাফ নয়, কবিতার বই সংগ্রহ করাই আমার হবি। দেখুন আপনার সব বই—আপনার কবিতা—'

বইয়ের তাকটা শোবার ঘরে, আপনার নিভৃতির মধ্যে। লোক-দেখানোর জন্য নয়, তাই ঠাঁই দেয় নি বাইরের ঘরে, বসবার ঘরে।

'অবাস্তবের মত লাগছে।' আবার বললে রুচিরা, 'কিন্তু দেখছেন তো নিজের চোখে—'

'বই কে দেখে!' ছোট ঘরে কতটুকু বা জায়গা তবু ঘুরে বেড়াতে লাগলো বিনায়ক।

'বা, বইই তো দেখবার।' রুচিরার কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠলো: 'জীবনে কত লাঞ্ছনা আমার এ বইয়ের জন্যে—সাহিত্যকে সাহিত্যিকের ভালবাসার জন্যে।'

'আপনি লেখেন?'

'লিখি? না, কাঁদি, শুধু কাটাকুটি করি।' হাসলো রুচিরা: 'আপনি দেখবেন?' বলেই সামলালো নিজেকে। 'না ওসব জঞ্জাল আজ থাক। আপনি বসুন—'

একটা মেয়েছেলে নড়ছে-চড়ছে।

'ও কে?' জিগ্গেস করল বিনায়ক।

'ঠিকে ঝি। বাড়িতে থাকে না। আর এই বাচ্চা চাকর, রতন,

রিফিউজি অনাথ ছেলে—আমার অফিসের ছোকরা। রাখি আমার পাশটিতে। প্যাসেজটাতে শোয়। আসুন—'

পাশের ঘরে, বসবার ঘরে, নিয়ে গেল।

চেয়ার-সোফা নয়, বসবার সরঞ্জামও তক্তপোশ। তার উপরে ফরাশ পাতা। নিচু মোড়া কখানা আছে আর ছোট গোল একটি টেবিল।

তক্তপোশেই বসলো বিনায়ক।

রুচিরা ফল কেটে এনে দিল।

বিনায়ক বললে, 'ডাক্তার বলেছে খাবার বদলাতে—'

'আরও বলেছে—'

চোখ তুললো বিনায়ক।

'বলেছে পরিবেশেরও বদল দরকার।' কিছু না ভেবেই বললো রুচিরা। তারপর শোবার ঘর থেকে একটা কবিতার বই কুড়িয়ে নিয়ে এসে বললে, 'কিছু পড়বেন আমার কবিতা ?'

'না, আজ নয়।' ওঠবার ভঙ্গি করল বিনায়ক।

কবিতা তো আজ শোনাবার নয়, শোনবার। অশ্রুতকে শোনবার। আর যখন চোখই সব কাজ করছে, দেখাই শোনা।

চোখের অনিদ্র উগ্রতা বিগলিত হবে নাকি ?

'উঠছেন ?'

'হ্যাঁ'—জোর করে উঠে পড়লো বিনায়ক।

ডাক্তারি চিকিৎসায় কেমন ফল দিল না জানি এতদিনে! একবার খোঁজ নেওয়া দরকার।

'কেমন আছেন ?'

কিন্তু এমনটি দেখবে ভাবে নি। তক্তপোশে শুয়ে ছটফট করছে বিনায়ক আর তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে একটা আহত পশুর আর্তনাদ। ভাঙা লণ্ঠন যত না আলো দিচ্ছে তার বেশি দিচ্ছে কালি। যত না চিৎকার তার বেশি বোধ হয় যন্ত্রণা।

সন্ধ্যায় কবির বাসা কেমন দেখতে হয়, একটু সাধ ছিল বুঝি রুচিরার। কিন্তু এমন চেহারা নেবে ভাবতেও পারে নি।

'ওষুধ খেয়ে কিছু উপকার হয় নি।' বললে বিনায়ক, 'বরং বেড়েছে।'

'বেড়েছে?' অসহায়ের মত শোনালো রুচিরাকে।

'ওষুধ ব্যর্থ হবে সেজন্য ভাবি না, কিন্তু মনে হচ্ছে কি জানেন?' উগ্র চোখে যেন অন্ধকারকে সম্বোধন করলে বিনায়ক: 'মনে হচ্ছে আর কবিতা লিখতে পারব না।'

'না, না, তা কি হয়—' বোকার মত শোনালো রুচিরাকে।

'কতদিন থেকে একটা কবিতা আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, কিছুতেই পারছি না মুক্তি দিতে। কিছুতেই না।'

কি বলবে বুঝতে না পেরে রুচিরা বললে, 'কী কবিতা?'

'ঘুম—ঘুমের কবিতা। নিবে যাবার ঘুম নয়, জ্বলে ওঠার ঘুম।'

তক্তপোশের আরও কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো রুচিরা। বললে, 'একটু চুপ করে থাকুন—আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, দেখবেন, ঘুমিয়ে পড়বেন আস্তে-আস্তে। একটু ঘুমিয়ে উঠতে পারলে দেখবেন আপনার কবিতা ফিরে এসেছে।'

নিঃসঙ্কোচে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো রুচিরা।

একটু যেন চুপ করেছে বিনায়ক।

তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে রুচিরা বললে, 'কোথাও চেঞ্জে পাঠাতে পারলে ভালো হত।' হঠাৎ আবার চিৎকার করে ওঠে কিনা সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি যোগ করলে: 'একটা ভ্যারাইটি শো অর্গানাইজ করছি। কিছু মোটা টাকা তুলতে পারব আশা করি।'

'তাই করুন। তাই দিন চেঞ্জে পাঠিয়ে। পালাতে পারাই বাঁচা। সুতরাং আপনিও চেঞ্জে যান। পালান এই অন্ধকূপ থেকে।' মাথার থেকে রুচিরার হাত ঠেলে দিল বিনায়ক: 'এখানে বেশিক্ষণ থাকলে আপনার আর কি যাবে জানি না, ঘুম যাবে।'

'যাই ডাক্তারকে খবর দিই গে।' চলে গেল রুচিরা।

সেই ভ্যারাইটি শোর ব্যবস্থা কি হল একবার খবর জানতে গেলে কেমন হয়? কদিন আগে এসেছিল রুচিরা? বেশি দিন নয়। এই কদিনে, নিশ্চয়ই কিছুটা ছক-নক্শা হয়েছে। জেনে এলে মন্দ কি।

কবে যাবে?

এখুনি গেলে কেমন হয়? কটা হবে এখন রাত? এগারোটা। সে এমন বেশি কি। এগারো, বারো, এক—প্রায় সারারাতই তো ঘুমের খোঁজে ঘুরে বেড়ায় বিনায়ক।

সদর সিঁড়িতে আলো জ্বলছে—সারা রাতই জ্বলে বোধ হয়—উঠে পড়লো বিনায়ক। দরজায় ঘা মারলো।

রতন উঠে খুলে দিল দরজা। রুচিরা শুয়ে ছিল, সেও উঠে এল।

'কিছুতেই ঘুম আসছে না। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে হচ্ছে মাথার মধ্যে যেন মরুভূমির বালি উড়ছে।' দেওয়ালটা ধরে ফেললো বিনায়ক: 'আজ ভেবেছি আত্মহত্যা করবো। বদ্ধ পাগল হয়ে গেলে আর আত্মহত্যা করা হবে না। ঘুম নেই বলে আমার শেষ ঘুমও কি থাকবে না?'

'এ কি, আপনি কাঁপছেন, টলছেন, আপনি একটু বসুন। স্থির হোন।' রুচিরা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো।

'আপনাদের ছাদ তো এজমালি। আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন। আমি সেখান থেকে লাফ দেব।' বলে উপরের দিকে যাবার ভঙ্গি করলো বিনায়ক।

হাত ধরে ফেলে বাধা দিল রুচিরা। টেনে বসবার ঘরে নিয়ে এল। বললে, 'আপনাকে এখানে বিছনা করে দিই। আপনি শুয়ে পড়ুন।'

রতনের সাহায্যে ক্ষিপ্র হাতে তক্তাপোশে বিছানা করে দিল রুচিরা। দুর্বল বাধ্য শিশুর মত শুয়ে পড়ল বিনায়ক।

'আমি ডাক্তারকে একটা খবর দিই।' রুচিরা ছটফট করে উঠলো।

'না, না, ডাক্তার ডাকতে হবে না। শুধু ঘরটা অন্ধকার করে দিন।' আর, চোখবোজা অন্ধকারে হাত বাড়ালো বিনায়ক: 'আর সেদিনের মত শিয়রে বসে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিন। আমার ঘুম আসবে, এমনিতেই আসবে।'

তবু রুচিরা বিবেচনা করে দেখলো এত বড় একটা সাজ্ঘাতিক রুগী একা ঘরের মধ্যে রাখা ঠিক হবে না। হার্টের অবস্থা কী, কে জানে। তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে গিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে ডাক্তারকে এক্ষুনি আসতে একটা চিঠি লিখে দিল। রতনকে বললে, 'শিগ্‌গির যা। মোড়ের পর ডাক্তারবাবুর ডিসপেনসারি, তুই তো চিনিস। ডাক্তার-বাবুকে এই চিঠি দিবি আর বলবি, সঙ্গিন রুগী—

রতন ছুট দিল।

সব শুনেছে, দেখেছে বিনায়ক। চাকরটাও নেই।

এত রাতে ডাক্তার আসবে না হাতি। বিনি পয়সার ডাক্তার। আর এলেই বা কি। একটা না হয় ওষুধ দিয়ে চলে যাবে। কে খাবে সেই ওষুধ। সে ওষুধ কে চায়!

বরং ভালো, এই একটা সরলতার ছদ্মবেশ থাকবে।

'রুচিরা!' নাম ধরেই ডাকলো বিনায়ক।

অদ্ভুত সাহস রুচিরার, হাসিমুখে ঘরে ঢুকলো।

'যতক্ষণ আমার ঘুম না আসে ততক্ষণ আমার শিয়রে একটু বসবে না?'

'বসছি। হঠাৎ উচ্ছল হয়ে বললে, 'আপনার কবিতার বই নিয়ে আসি, আপনি পড়বেন।'

আজ, এখন, রাজি হল বিনায়ক।

কিন্তু কবিতার বই বুঝি আর বাছা হয় না রুচিরার। শোবার ঘরে গিয়ে খিল দিল নাকি?

'রুচিরা!' আবার ডাকলো বিনায়ক।

কবিতার বই হাতে নিয়ে রুচিরা ঘরে ঢুকলো। নিজেই বার করে দিল সবচেয়ে যেটা দীর্ঘ। একটার পর আরেকটা। আরেকটা।

আজ বুঝি কবিতা দেখবার রাত নয়, কবিতা পড়বার!

কেমন একটা ধিক্কার এল বিনায়কের মনে। এতদিন সে কী লিখেছে? শুধু তিক্ততা, শুধু শ্লেষ, শুধু রোষ, শুধু বিদ্রূপ। একটা প্রেমের কবিতা লেখে নি? এ-বই ও-বই পৃষ্ঠা ওলটাতে লাগল বিনায়ক।

'এবার আলোটা নিবিয়ে দাও।'

'ডাক্তার আসুক। দেখি আসে কিনা—' সমুদ্রে খড় ধরলো রুচিরা।

অন্য কবির কবিতা চাইলো এবার বিনায়ক। পরিপূর্ণ ভালবাসার কবিতা। জীবনকে ভালবাসার, ভালবাসাকে ভালবাসার কবিতা।

হঠাৎ ঝলমলিয়ে উঠে পড়লো রুচিরা।

'ডাক্তারের গাড়ি। ডাক্তার এসেছে।'

রুগীর মত শুয়ে পড়লো বিনায়ক। কি জানি, ইনজেকশানে ঘুম পাড়িয়ে দেবে নাকি? দুরু দুরু ভয় করতে লাগলো। না কিছুতে না, দিতে দেবে না ইনজেকশান। ওষুধের ঘুম নয়, স্বভাবের ঘুম চাই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল সুব্রত, সঙ্গে রতন।

'কই, রুগী কই?'

'এই যে, এই ঘরে—' বসবার ঘরে না গিয়ে শোবার ঘরে নিয়ে এল রুচিরা। বললে, আপনার সোফারকে বলে পাঠাই ফিরে যেতে। কাল সকালে এসে নিয়ে যাবে আপনাকে। বাইরে এমনি থাকবার তো আপনার অভ্যেস আছে।'

সুব্রত গম্ভীর মুখে বললে, 'না থেকে করি কি। দেখতেই পাচ্ছেন রুগীপত্র ডাক্তারের থাকেই।'

'তাই চাকরটাকে ডাকি।'

'এত রাতে সোফার নেই। আমি নিজেই ড্রাইভ করে এসেছি।'

'তবে চাকরটাকে বলি আপনার গাড়ির মধ্যে ও শু'ক।'

'আর আমি ?'

'আপনি এই ঘরে, আমার এখানে।'

'তার মানে ?'

ঘরের পর্দা টেনে দিল রুচিরা। বললে, 'বোস, বলছি।'

খাট ছাড়া আর বসবার জায়গা কোথায় ? সুব্রত পাতা বিছানার এক পাশে বসলো।

রুচিরা বললে, 'আমাদের মামলার পরের তারিখটা কবে ?'

'দিন কয়েক পরে। বোধ হয়—দাঁড়াও ডায়রিটা দেখি।' ডায়রি পকেটেই থাকে, বার করলো সুব্রত।

'সেটা কি জন্যে আছে ?'

'সেদিন আমাদের দু পক্ষকে সশরীরে কোর্টে হাজির হতে হবে।' বললে সুব্রত, 'কোর্টে মানে জজের চেম্বারে। কিছুক্ষণ আমাদের থাকতে হবে বা নিভৃতে। দেখতে হবে মিটমাট হয় কিনা মামলার—'

'কবে তারিখ বললে ?'

ডায়রির পাতা ওলটাতে লাগলো সুব্রত। বললে, 'দেরি আছে।'

'না, দেরি নেই, সে তারিখ আজ। এই রাত্রে। অন্তত আজকের রাতটার মত মিটুক—মিটুক খানিকক্ষণের জন্যে।'

সুব্রতর দিকে দু পা এগিয়ে এল রুচিরা।

'শুধু খানিক্ষণের জন্যে ?' সুব্রত তাকালো রুচিরার চোখের দিকে।

'অন্তত খানিক্ষণের জন্যে। যতক্ষণ না ও চলে যায়।'

'কে এই লোকটা ?'

সব বললে রুচিরা। বললে, 'মদ খেয়ে এসেছে। আজকে রাতে আমার পাশে থাকতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।'

'তুমি পাড়ার লোক জড় কর নি কেন ?' রুখে উঠল সুব্রত।

'ছি।' নিবৃত্ত করলো রুচিরা। বললে, 'মানী লোকের মান রাখতে হয়। কত বড় কবি-সাহিত্যিক। তারপর অসুস্থ। অপ্রকৃতিস্থ। সবদিক দিয়েই তাই বিঘ্ন। আজকের দিনে আমাকে এবং ওকে

একমাত্র রক্ষা করতে পার তুমি। ওর অস্তিত্ব যদি ক্ষণিকের হয় আমাদের মিটও না হয় তাই হোক।' দরজা বন্ধ করে দিল রুচিরা।

এ কি, কই, ডাক্তার আসছে না তো এখনও। স্বাতঙ্ক প্রতীক্ষায় সমস্ত স্নায়ু শিরা তীক্ষ্ণ করে রেখেছে বিনায়ক। এই এল বুঝি। ইনজেকশানে ওষুধ ভরছে বোধ হয়। হয়তো সূঁচটা পরীক্ষা করছে। এই এসে পড়বে।

সময়ের স্রোত আতঙ্কের উপলখণ্ডের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে।

এ কি এক চমক ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? ধড়মড় করে উঠে বসলো বিনায়ক। সেই থেকে আলোটা জ্বলছে! আলোটাই আশা। আলোটাই আশ্রয়।

এতক্ষণে নিশ্চয় চলে গিয়েছে ডাক্তার। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বোধ হয় ভেবেছে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু রুচিরা কই?

এবার আর ডাকলো না, নিজেই এগোলো রুচিরার ঘরের দিকে। এ কি, ঘর বন্ধ।

বেশ তো যদি এখন তাকে চলে যেতে হয় বাড়ি ছেড়ে, তবে সিঁড়ির দিকের দরজাটা বন্ধ করবে কে? কই চাকরটাও তো নেই কোথাও।

'রুচিরা।' মৃদুস্বরে ডাকলো বিনায়ক।

দরজা খুলে দিল সুব্রত। ডাক্তারের পোশাকে নয়, গৃহস্থের পোশাকে। গায়ে গেঞ্জি, কোমরে লুঙ্গির মত করে একটা শাড়ি জড়ানো।

দু পা পিছিয়ে গেল বিনায়ক।

তবু বললে, 'রুচিরা কোথায়?'

'ঘুমুচ্ছে।' সুব্রত বললে।

'ঘুমুচ্ছে?' স্পষ্ট দেখতে পেল বিনায়ক আলো জ্বালা ঘরে বিছানায় শুয়ে আছে রুচিরা।

'আমি এবার চলে যাব। দরজাটা বন্ধ করে দিতে বলুন।' পাংশুমুখে বললে, বিনায়ক। তাড়িয়ে দেবার আগে মানে মানে সরে পড়াই ভালো।

'এখন চলে যাবেন কি! সুব্রত ডাক্তারি গলায় ধমক দিয়ে উঠলো: 'এই মধ্যরাতে এই অবস্থায় কেউ কখনও যায়? যান, শুয়ে পড়ুন গে, কাল সকালে যাবেন।' দরজা ফের বন্ধ করলো সুব্রত।

কি জানি কেন যেতে পা উঠলো না বিনায়কের। টলতে-টলতে তার ঘরের মধ্যে এসে বিছানায় ভেঙে পড়লো। বুক কাঁপছে, সমস্ত শরীর কাঁপছে। ডাক্তারকে ডাকবার, কাউকে ডাকবারই ভাষা নেই, শক্তি নেই।

কুঁকড়ে শুয়ে পড়লো। চোখ বুজলো।

কতক্ষণ পরে সুব্রত নিজের থেকেই এসেছে এ-ঘরে।

'ভালোই হয়েছে আপনি এসেছিলেন। আপনার এক অনিদ্রা দিয়ে আমাদের দুই অনিদ্রা মুছে দিয়েছেন। আমাদের বিচ্ছেদের মামলা মিটে গিয়েছে, আপনারটাও মিটুক। শান্তি হোক। আমাদের বিচ্ছেদ প্রেমের—আপনার ঘুমের। কি তাই নয়? না, না, কোনও লজ্জা নেই, ভয় নেই, হার-মার নেই, শুধু অনিদ্রা—সর্বত্র অনিদ্রা। অনিদ্রাই ব্যাধি, অনিদ্রার জন্যই যত গোলমাল। জীবনে সাহিত্যে রাজনীতিতে সমাজনীতিতে সবখানে অনিদ্রা। কি ঠিক বলছি না?'

এ কি, কি হল বিনায়কের? একটা উত্তর তো অন্তত দেবে।

নিচু হয়ে কাছে ঝুঁকে পড়লো সুব্রত।

বিনায়ক শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

॥ ঘুষ ॥

ঘরে পর্দা একটা আছে বটে কিন্তু সে একটা ব্যবধানই নয়। মে আই কাম ইন স্যর—এ সব মামুলি শিষ্টাচারও উঠে গেছে। স্লিপ ঝুলছে না দরজার কড়ায়? ও সব অবান্তর। লেখার ধৈর্য নেই। পার্পাস অফ ভিজিট বা দেখা করার উদ্দেশ্য এমন হতে পারে যা লিখে জানাবার নয়। আরদালী ছুটো করে কি? ওদেরকে প্রস্তুত হতে সময় দিলে তো! যদি বাধা দেয় হয়তো বা বাইরে থেকেই হৈ-হল্লা শুরু করবে। কে জানে বা, আওয়াজ তুলবে।

মুখ-চোখ লাল, খুব উত্তেজিত অবস্থায় ভদ্রবেশী এক যুবক ঢুকলো খাসকামরায়। 'আপনার কাছে একটা নালিশ আছে।'

ঘরের মধ্যে পাইচারি করছিল হিমাদ্রি, শান্তস্বরে বললো, 'বসুন।'

বসলে যেন উত্তেজনা কমে যাবে, এমনি ছটফট করছিল আগন্তুক। বললে, 'এমনি ধারা অত্যাচার আর কতদিন সইতে হবে?'

'বেশি দিন নয়।' স্বর যথেষ্ট হালকা করলো হিমাদ্রি। বললে, 'সিগারেট খান?'

সিগারেট বাড়িয়ে ধরলো। খাই বলতে সাহস হল না যুবকের। নিমেষে নিস্তেজ হয়ে পড়লো। বসলো।

হিমাদ্রি বেড়িয়ে সিগারেট ফুঁকতে লাগল।

'আপনি আমার নালিশ শুনবেন না?'

'নিশিদিন নালিশ শুনছি। সন্ধ্যের দিকে শ্মশানে গিয়েছি মড়া পোড়াতে সেখানেও বেইল-পিটিশন নিয়ে ধাওয়া করেছে।' জানলা দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ওড়াল হিমাদ্রি।

'তবে আমার নালিশটা শুনুন।'

'নিশ্চয় শুনব।' হিমাদ্রি নিজের চেয়ারে বসলো। 'কিন্তু বলি কি, নালিশ দু রকমের আছে। এক, লিখে ; আরেক মুখে। বলি কি, লিখে দিন। আপনার উকিল নেই ?'

'উকিল কখনও লিখবে যে আমলা ঘুষ খেয়েছে ?' যুবক মাথা নাড়লো। 'কোনওদিন লিখবে না।'

'লিখবে না ?' হাসলো হিমাদ্রি।

'লিখলে কি প্র্যাকটিস করা চলবে এ রাজত্বে ? যা শত্রু পরে-পরে, আমলায়-মক্কেলে, বলে সরে পড়বে।'

হিমাদ্রি গম্ভীর হবার মত মুখ করলো। ব্যাপারটা কী তবে বলুন।

যুবকের নাম বীরেশ বসু। একটা টাকার মামলা আছে দ্বাদশ সাবজজ কোর্টে। অগ্রিম ক্রোকের অর্ডার হয়েছে হাকিমের, কিন্তু কেরানী পরোয়ানা বার করছে না।

'কী বলে ?'

'কী আবার বলবে ! টাকা চায়।'

'দিয়েছেন ?'

'না।'

'তবে তো ভালোই।' টান-টান ভাবটা নরম হল হিমাদ্রির।

'ভালোই ?' যুবক টেবিলের উপর একটা চাপড় দিয়ে বসল। 'কিন্তু ও চাইবে কেন ?'

'চাওয়া পর্যন্ত অপরাধ নয়।'

'নয় ?'

'না। কত জিনিসই তো আমরা চাই, কত অন্যায় চাওয়া, কত অপরাধের চাওয়া, কই, কেউ কিছু বলতে আসে না। আপনিই বলুন, চাইলেই কি আর নেওয়া হয় ? হাত বাড়ালেই কি কাঙ্ক্ষিতকে ধরা যায় ?'

কাব্যে-দর্শনে নেই লোকটা, নিরেট কাঠঠোকরা। ঝাঁজালো গলায় বললে, 'তাহলে ক্রোকের পরোয়ানা বেরুবে না আমার ?'

'নিশ্চয়ই বেরুবে।' হিমাদ্রি পাশ থেকে নথি টেনে নিল। 'আপনার উকিলকে দিয়ে বলান হাকিমকে। দ্বাদশ গোপালকে।'

'উকিলকে দিয়ে বলাবো?' বিরক্তি-লেখা মুখে যুবক বললে, 'বলাতে গেলেই আবার হাঁকবে।'

'এই সামান্য একটা কথা—' বেদনার্ত ভাব করলো হিমাদ্রি।

'ওদের কথা বলবেন না। ওরা চতুর্ভুজ। এপাশে-ওপাশে হাত তো আছেই, ওদের আবার সামনে-পিছনেও হাত। উকিল লাগাতে গেলে আরও লোকসান।'

'তা ছাড়া,' নথির মধ্যে চোখ ডোবালো হিমাদ্রি। 'পরোয়ানা কোর্ট থেকে বেরুলেই বা কী! নাজিরখানা আছে না? পিয়নের কাছে হাওলা হওয়া আছে না? জারি দেরিতে না তাড়াতাড়ি হবে তার প্রশ্ন আছে না? সব চেয়ে বড় কথা, ঠিকমত জারির রিপোর্ট আছে না?'

'মানে প্রতি পদেই—'

'প্রায়। বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা।'

'কোনই প্রতিকার নেই?'

'কত যুগ-যুগ ধরে গবেষণা হচ্ছে, বার করুন না প্রতিকার। কুষ্ঠের মতই প্রাচীন রোগ—'

'কুষ্ঠ সারছে—'

'কিন্তু ঘুষ মরবে না। যতদিন উকিলকে ফি দেওয়া থাকবে ততদিন আমলাকেও ঘুষ দেওয়া থাকবে। ভেবে নিন আমলাকে যেটা দিচ্ছেন সেটা উকিলেরই ফি-এর মধ্যে দিচ্ছেন—'

কোনও দর্শন-ইতিহাস শুনবে না বীরেশ, না-কোনও অর্থনীতি-সমাজনীতি, চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো হঠাৎ। বললে, 'তবে আপনার কাছে এসেছিলাম কেন?'

'অকালযাত্রা করেছিলেন। যে কোর্টের ব্যাপার সেই কোর্টের হাকিমের কাছে গিয়ে নালিশ করুন।'

'আপনি সকলের মাথা।'

'সেই জন্যেই তো হাতে মাথা কাটতে পারি না।' হিমাদ্রি নথি ওলটাতে লাগল। 'যেখানে অপরাধ এখনও হয় নি, যেটা মাত্র আকাঙ্ক্ষার এলাকায় সেখানে আইন, তার বাহু যতই দীর্ঘ হোক, পারে না ঢুকতে। এ তোমার বাঙালী জজের খাসকামরায় ঢোকা নয়—'

'অসম্ভব।' রাগে চোখ মুখ লাল করে বেরিয়ে গেল বীরেশ।

'শুনুন—' ডাকলো হিমাদ্রি। সঙ্গে-সঙ্গে কলিং-বেলও টিপলো।

না, ফিরেছে বীরেশ। আরদালী একটা এসেছিল ঘণ্টা শুনে, তাকে হিমাদ্রি চলে যেতে বললে।

'বসুন।'

বসলো বীরেশ।

'আপনি কী করেন?'

'চাকরি।'

'কী চাকরি? কোথায়?'

নাম-ধাম দিল চাকরিটার। বেশ মোটাসোটা চাকরি।

'বিয়ে করেছেন?'

'না।'

'তাই—' এক নথি ছেড়ে আরেক নথিতে মন দিল হিমাদ্রি।

'তাই মানে?'

'আজ অফিস যান নি?'

'না, ছুটিতে আছি।'

'তাই! অত অঢেল সময় ও ঢিলেঢালা জীবন না হলে কেউ কি এ নিয়ে মাথা ঘামায়? যা দিতে হবে তা দিয়ে দেয়। গভর্নমেণ্টকে কোর্ট-ফি দেন নি? তলবানা? এভিডেভিট?'

'ওই আর এ এক হল?' বীরেশ আবার ছটফট করতে লাগলো।

'এ পিঠ আর ও পিঠ। আসলে বস্তু এক, সার এক। মন্দিরে প্রণামীর থালায় পয়সা দেন না? তীর্থে, রেল-স্টেশনে, হোটেলে, হাসপাতালে? যা পরে দিলে বকশিশ তা আগে দিলেই ঘুষ। চুমু

পরে দিলে আদর, আগে দিলে বলাৎকার। আপনাদের অফিসে এই কারবার নেই?'

'কী কারবার?'

হাসলো হিমাদ্রি। 'এই লেনদেন, গোঁজাগুঁজি, ঘুষাঘুষি—'

লজ্জিত হল বীরেশ। বললে, 'থাকলেও এত নয়। এ স্যর, যেখানে হাত রাখি সেখানেই ঘা।'

'তা তো বটেই। পরের ছিদ্র বেল, নিজের ছিদ্র সরষে।'

'একটা অন্যায় আছে বলে আরেকটা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে হবে?' আবার মুখিয়ে উঠলো বীরেশ। 'এটাই বা কোন ন্যায়?'

'তা ঠিক। বিয়ে করেন নি কিনা তাই আদর্শের কথা ভাবছেন।' হিমাদ্রি আরেকটা সিগারেট ধরালো। বললে, 'তা, কোথাও-কোথাও সঙ্গীত আছে, কবিতা আছে, থাকলই বা না আদর্শ। হ্যাঁ, ওই কেরানীটার নাম কি বললেন?'

'কোন্ কেরানী?'

'যে আপনার কাছে টাকা চেয়েছে।'

'উপানন্দ না রূপানন্দ।'

'রূপানন্দই ঠিক। শুনুন,'—কণ্ঠস্বরে একটু ঘনিষ্ঠ হল হিমাদ্রি। 'যদি কিছু ফল চান, তা হলে ওকে সত্যি সত্যি টাকাটা দিন।'

'দেব?'

'বেশ সাক্ষী রেখে দিন, স্বার্থহীন সাক্ষী। পুলিস-টুলিস মুহুরি-ফুহুরি না হয়। যদি পারেন নোটটা মার্ক করে সাক্ষীদের দেখিয়ে নিয়ে গুঁজে দিন। তারপর ওর পকেটস্থ হবার পর ওকে চ্যালেঞ্জ করুন। সবাই মিলে হামলা করে পড়ুন ওর ঘাড়ের উপর। যদি নোটটা সারেণ্ডার করে করুক, অফেন্স আগেই হয়ে গিয়েছে, নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই হয়ে গিয়েছে। সারেণ্ডার না করে বা ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে, কিছু এসে যায় না। আপনার সাক্ষী আছে ওর চাওয়ার আর আপনার দেওয়ার। তাতেই হবে। সাক্ষীর জোরেই মামলার জোর। যান,

ব্যাপারটা চাওয়ার মধ্যে না রেখে খাওয়ার মধ্যে নিয়ে যান। তারপর দেখবো।'

খুব উৎসাহিত হল বীরেশ।

'আচ্ছা—' বেরিয়ে গেল বীরদর্পে।

এত তৎপরতা কল্পনা করতে পারতো না হিমাদ্রি। পরদিনই বীরেশ একেবারে বিস্তৃত এক দরখাস্ত নিয়ে হাজির।

'একেবারে আজই?'

'হ্যাঁ, দেরি করে ফেললে সাবধান হয়ে যেত'—নিজের থেকেই সশব্দে বসলো বীরেশ। 'বুঝতে পারতো কল পাতা হচ্ছে। তাই লোহা গরম থাকতে-থাকতেই মেরেছি হাতুড়ি।'

বারান্দায় আরও কতগুলি লোক।

'এরা কারা?' পশ্চাতে ইঙ্গিত করল হিমাদ্রি।

'এরা সব সাক্ষী। এরা দেখেছে।'

দরখাস্তেও আছে এদের বিবরণ। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সম্ভ্রান্ত সাক্ষী। দুজন বীরেশের অফিসের লোক আর বাকি তিন জন আদালতে-আসা ভাগ্যহত।

নিবিষ্ট হয়ে দরখাস্তটা পড়ল হিমাদ্রি।

বললে, 'দেখুন, এখন দুরকম হতে পারে।'

'দুরকম?' তাকালো বীরেশ।

'দরখাস্ত যদি আমাকে বিচার করতে দেন তাহলে ডিপার্টমেণ্টাল ইনকোয়ারি হবে আর যদি ফৌজদারিতে দেন তাহলে দস্তুরমত কেস করতে হবে।'

'আপনার কাছে বিচার হলে ফল হবে না?'

'হবে। তবে কম হবে।'

'কম হবে মানে?' বীরেশ নড়েচড়ে উঠলো। 'যদি প্রমাণিত হয় ও ঘুষ খেয়েছে তাহলেও কম?'

'কম হবে মানে শুধু ডিসমিস হবে।' হিমাদ্রি শান্ত স্বরে বললে,

'আর ফৌজদারিতে প্রমাণিত হলে জেল হবে, আর জেল হলে ডিসমিস তো হবেই। তবেই দেখছেন ফৌজদারি হলে জেল আর ডিসমিস আর আমার কাছে হলে শুধু ডিসমিস। তাই একটু কম হল না?'

এক মুখ হাসলো বীরেশ। বোধ হয় বা একটু দয়া হল উপানন্দের জন্য। বললে, 'আপনার কাছেই হোক। ডিসমিসই যথেষ্ট। সঙ্গে আর জেলের দরকার কী? মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘায়ে দরকার নেই।'

পিছন থেকে একজন সাক্ষী বললে, 'নিচের পোস্টে নামিয়ে দিলেও যথেষ্ট শাস্তি।'

'কপিইং ডিপার্টমেন্টে কিংবা রেকর্ড রুমে—' আরেকজন কে পরামর্শ দিল।

'কিংবা কয়েকদিন সাসপেণ্ড করে রাখলেই সমুচিত শিক্ষা পাবে।'

'হ্যাঁ, সার্ভিস-বুকে একটা কালো দাগ পড়লেই এনাফ—'

এখন একে-একে সকলেই উপানন্দের প্রতি সহানুভূতিতে নরম হচ্ছে। যতক্ষণ সে ঘুষখোর ততক্ষণ সে অত্যাচারী, আর যেই সে আসামীর পর্যায়ে তখনই তার প্রতি সমবেদনার ঢেউ।

যে ছিল সর্বমারা সেই আবার এখন সর্বহারা।

'না, যখন লিখিত নালিশ হাতে এসেছে তখন আর কথা নেই। আর পাশ কাটিয়ে যাওয়া নেই, এখন আইন তার পথ নেবে।' হিমাদ্রি নির্বাষ্প আইনের গলায় বললে।

সংশ্লিষ্ট কোর্টের হাকিমের কাছে দরখাস্ত ফরোয়ার্ড করে দিল হিমাদ্রি। নির্দেশ দিল, প্রেসিডিং কর উপানন্দের বিরুদ্ধে আর তদন্তান্তে পাঠাও তোমার রিপোর্ট।

সংশ্লিষ্ট কোর্টের হাকিম ফলাও করে তদন্ত শুরু করলো। আর তিন মাসের মাথায় রিপোর্ট দিল, অভিযোগ সত্য, ঘুষ খেয়েছে উপানন্দ।

পরিচ্ছন্ন সিদ্ধান্ত। স্ফটিকস্বচ্ছ।

এখন শাস্তি দেওয়ার ভার হিমাদ্রির—জেলাধিপতির।

ডিসমিস্ করার এক্তিয়ার শুধু তার। নিম্নের হাকিমও ডিসমিস সুপারিশ করেছে।

উপানন্দ এসে কেঁদে পড়লো খাসকামরায়।

বোধ হয় সে এতদিন ভেবেছিল ঘটনাটা বিশ্বাস করবে না হাকিম। কেউ কি এমন বোকা হয় যে সরাসরি কোনও পক্ষের থেকে ঘুষ নেবে? ঘুষ নিতে হয় উকিল-মুহুরির কাছ থেকে, যারা লক্ষ্মী, যারা কোনদিন নালিশ করবে না—ঘুষ আদায় করতে হয় সেরেস্তায় চাপরাসী পাঠিয়ে, আদালত উঠে যাবার পর। যা কাহিনী বীরেশের, আষাঢ় মাসে ঘোর বর্ষার দিনেও চলে না। কিন্তু কে না জানে ছুর্লোভে লোকে ছুংসাহসী হয় আর ছুঃসাহসই বোকামি করে বসে।

উপানন্দের সগোত্রীয়দেরও সেই অভিযোগ—বোকামি, স্রেফ বোকামি। বোকা না হলে অত লোকের সামনে কেউ হাত পাতে? নিজের হাতে কেউ তামাক খায়?

কে অপরাধী? বোকাই অপরাধী।

যে সারতে পারে সেই সারাৎসার।

সেই মামুলী কান্না উপানন্দের—প্রকাণ্ড সংসার, রুগ্ন স্ত্রী, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, ছোট ছুটো ভাই কলেজে পড়ছে, বোনটার বিয়ে দিতে পারি নি, অন্ধ মা—আর কেউ তেমন রোজগেরে লোক নেই—

'ধরা পড়ার সময় মনে ছিল না?' ধমকে উঠল হিমাদ্রি।

'বুঝতে পারি নি এমন ষড়যন্ত্র।'

'তা বুঝতে পারবেন কেন? বুঝতে পারলে এমন দশা হয়?' গলা নামালো হিমাদ্রি। 'বুঝতে পারলে কেউ এখানে আসে?'

'এখানে না আসব তো—'

'এখানে আসে মানে খাসকামরায় আসে?' হিমাদ্রি খিঁচিয়ে উঠল। 'প্রত্যক্ষ সাক্ষী রেখে ঘুষ, প্রত্যক্ষ সাক্ষী রেখে তদবির! বোকা কি আর লোকে মিছে বলে?'

এতক্ষণে উপানন্দের বুদ্ধি খেললো। চট করে গুটিয়ে নিল

নিজেকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে বাইরে নিজে গাঢাকা দিয়ে থেকে হিমাদ্রির বাড়িতে, বসবার ঘরে পাঠিয়ে দিল উর্মিলাকে।

রাত্রে আরদালীরা বিদায় নিয়ে গিয়েছে এমন সময়।

চাকর এসে বললে, কে একজন এসেছে।

'কে? এ অসময়ে কে?'

অসময়ে রসময়ই আসেন—হিমাদ্রির এমনি মনে হল ঘরে ঢুকে।

ঋদ্ধিতে-বৃদ্ধিতে সমুজ্জ্বল একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। ঘনপীন লাবণ্যের উচ্ছ্বাস। সাম্যে স্বাস্থ্যে সুস্থিরশ্রী।

'এ কে?' হিমাদ্রির মুখে কথা নেই।

দুহাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে লাগলো উর্মিলা।

'সে কি? বসো।'

কথা শুনছে এমনি বাধ্য ভঙ্গিতে বসলো উর্মিলা। চোখ নিচু করে রইলো।

'কোথাকার মেয়ে তুমি?'

কী অদ্ভুত প্রশ্ন! কান্নাভরা ফুলো ফুলো চোখে তাকালো উর্মিলা। কার মেয়ে না, কোথাকার মেয়ে! মানে তুমি থিয়েটারের, না, সিনেমার? ইস্কুলের, না অফিসের? রেলের না টেলিফোনের?

মোটেই সে ইঙ্গিত নয়। তাৎপর্য হচ্ছে তুমি স্বর্গের না পৃথিবীর?

উর্মিলা বললে, 'আমি হাসপাতালের মেয়ে।'

'রুগী?'

'না।' নিজের গতি ও গঠন সম্বন্ধে সচেতন, উর্মিলা লজ্জার ভাব করলো।

'তবে? হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছ, না, যেতে চাও হাসপাতাল?' উকিল মামলা বোঝাতে পারছে না—তেমনি ধারা বিরক্তি হিমাদ্রির কণ্ঠে।

'না। আমি জুনিয়র নার্স, সবে ট্রেনিং শেষ করে কাজে ঢুকেছি। কাজে মানে হাসপাতালে। প্রাইভেট হাসপাতাল। হাসপাতালটা বাজে—'

'তুমি নার্স?' কণ্ঠের খুশিকে চেষ্টা করেও চাপতে পারলো না হিমাদ্রি। 'তবে তোমার মাথায় শিখীপুচ্ছ কই? কুলোপানা চক্র?'

হাসলো উর্মিলা। বললে, 'এখন আমার অফ-ডিউটি।'

'কিন্তু এ বাড়িতে তোমার কোনও ডিউটি আছে বলে তো মনে হয় না।' হিমাদ্রি বসলো এতক্ষণে। 'আমরা সবাই তো আপাতত সুস্থই আছ।'

'কিন্তু আমরা?' দু হাঁটুর উপর বুক-মুখ নামিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগলো উমিলা।

বুক-মুখ ঢেকেছে কিন্তু ব্যক্ত করেছে পিঠ আর ঘাড় আর চুলের পিণ্ড। যাকে একবার ভালো লাগে তার সব কিছুই বুঝি ভালো দেখায়। এক ভালোকে অবলম্বন করেই সহস্র ভালো। গাছের একটা পাতা দেখ। একটা মুখ্য শিরাকে অবলম্বন করে শত-শত প্রশিরার বিস্তৃতি। দেখ মানুষকে। একটা মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করে সর্বাঙ্গের স্নায়ুজাল। এক ভালোতে সব ভালো।

'কিন্তু ব্যাপারটা যদি খোলসা করে না বলো কিছু বুঝবো না।' হিমাদ্রি যেন মমতার থেকে বললে।

'আমি উপানন্দ বিশ্বাসের ছোট বোন।'

মস্তিষ্ক বেশ পরিষ্কার উপানন্দের। গুচ্ছের ছেলেপিলে সমেত রুগ্ন স্ত্রীকে যে পাঠায় নি তদবিরে, বাহবা দিতে হয়।

'সামান্য মাইনে, মেহনত অকথ্য। চেয়ারে বসে বসে ঘুমনো, আর ঘণ্টা শুনে ছোটা—'

'মহৎ কাজ।'

'আপনি যদি একটু মহৎ হন, সদয় হন। আর যা শাস্তি দিন, চাকরিটা নেবেন না। এই প্রথম অপরাধ—'

'প্রথম? বলতে পার ধৃত-প্রথম।' হিমাদ্রি তাকালো তীক্ষ্ণ চোখে। 'কিন্তু তোমার, তোমার কী অবস্থা?'

কথাটা হয় বুঝলো না, নয় গায়ে মাখলো না উর্মিলা। বললে, 'দাদার

যদি চাকরি যায় আমারও চাকরি যাবে। অদ্ভুত হাসপাতাল, রুগী ভত আসে না। রুগী কম পড়লে অফ হয়ে যাই। বাড়ি থেকে চাকরি করা। তা দাদার যদি চাকরি যায়, মাথা গোঁজার ঠাঁই উঠে যাবে। সব ছন্ন হয়ে যাবে। পথে এসে দাঁড়াবো।'

'বেশ তাই দাঁড়াও তবে।' তির্যক চোখে তাকালো হিমাদ্রি। কঠিন কথা কিন্তু কঠিনের মত শোনালো না।

'পথে?'

'না, আমার সামনে।'

'দাঁড়াবো?' সত্যি-সত্যি দাঁড়িয়ে পড়লো উর্মিলা।

'না, আজ নয়, আরেক দিন।' ঘুষ নেওয়ার মতন করে চাপা গলায় বললে হিমাদ্রি। 'দাঁড়াবে তোমার সেই পাখামেলা ফণাতোলা পোশাকে। ভারি বোমাণ্টিক লাগে আমার ওই পোশাকটা। আর ওই খুটখুট জুতোব আওযাজ—'

'বেশ, আরেকদিন তবে আসবো।' দরজার দিকে পা বাড়ালো উর্মিলা: 'কবে বলুন?'

শুধু দিন নয় ক্ষণও ঠিক করে দিল হিমাদ্রি।

একেই বলে বুঝি ঘুষ। ফাউ। বাঁধা বরাদ্দের বাইরে মহান উপরি পাওনা। বাইবে এসে উপানন্দের সঙ্গে সামিল হল উর্মিলা। বললে, 'আরেকদিন আসতে হবে।'

কড়া ইস্ত্রিব ধোপদস্ত পোশাক পরে দাঁড়ালো এসে উর্মিলা। দিন নয়, রাত আব, ক্ষণ? ক্ষণ নয় লগ্ন।

'যার যা পোশাক তাকেই তা মানায়।' ঘুষখোরের চোখে তাকালো হিমাদ্রি। 'ময়ূরকে মানায তার পুচ্ছে। আর সে পুচ্ছ যখন পেখম হয়ে ওঠে। তুমিও তেমনি এখন পেখম মেলেছ।'

'আমি?' লজ্জায় বিহ্বল হল উর্মিলা। 'আমার এ হুড-এর জন্যে বলছেন?'

'হ্যাঁ। মাথায় ঘোমটা থাকলে বলতাম না।' হিমাদ্রি বসলো

চেয়ারে। 'এ শিরশ্ছদের আরেক রূপ আরেক ইঙ্গিত। তুমি সীমন্তিনী না, তুমি চিরন্তনী।'

'তেমনি আপনারও তো পোশাক আছে।' নিজেই বসলো ঊর্মিলা।

'সে তো যাত্রাদলের পোশাক। রঙ্গমঞ্চে ভীমের পার্টের।'

'ভীমের পার্টের? আপনি ভীম নাকি?'

'হ্যাঁ, আর কলম আমার গদা। ভীম কি আর সাধে হয়েছি? সামনে যে সব শকুনির দল। শকুনির সঙ্গে কি ধর্মাবতার যুধিষ্ঠির পারে? ভীম পারে।'

'তাই তো ভয় করে আপনাকে।'

'কিন্তু তোমার কাছে তো আমি রুগী। রুগীকে কী ভয়! আর জানো—' হিমাদ্রি বুঝি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'পোশাকের নিচেই নগ্নতা। কবরের নিচেই কঙ্কাল, সাফল্যের নিচেই দারিদ্র্য।'

করুণ করে হাসলো ঊর্মিলা। কথা বললো না।

'তবু এই পোশাক আছেই মুক্ত হবার জন্যে।' হিমাদ্রি ক্লান্ত সুর আনলো ভঙ্গিতে। 'কবর শূন্য হবার জন্যে। আর সাফল্য, সুনাম,— সব খরচ হয়ে যাবার জন্যে।'

'এবার তবে উঠি—'

'সে কি?'

'যাই পোশাক থেকে মুক্ত হই গে।' হাসিতে ঝলমল করতে-করতে উঠে দাঁড়ালো ঊর্মিলা। 'কৃত্রিমকে দূর করে স্বাভাবিক হই। বাড়ি গিয়ে হই আবার সাধারণ মেয়ে সংসারী মেয়ে—' দরজার দিকে স্পষ্ট পা বাড়ালো।

'বা, আমি যে রুগী, আমাকে ফেলে যাবে কি করে?'

'রুগী? বেশ তো, চলুন হাসপাতালে, বেড নিন।' বিদ্যুতে স্থির হয়ে দাঁড়ালো ঊর্মিলা।

'বেড নিতে হবে, বিছানায় হবে না। তার মানে বাড়িতে রুগী হলে চলবে না বলছ?'

'না তাও চলবে। কিন্তু তার জন্যে লিখতে হবে, দরখাস্ত করতে হবে প্রপার চ্যানেলে। সব কিছুরই একটা রীতি আছে, প্রসিডিউর আছে। যেমন দেশে যেমন আচার—' ইশারায় ভর-ভর চটুল চোখে তাকালো ঊর্মিলা।

ঠিকই তো। সব কিছুরই একটা সিঁড়ি আছে, ধাপ আছে, পর্ব-পরিচ্ছেদ আছে। আইনকানুন আছে। এ তো হোটেলে ডাকবাংলোয় ধরে আনা নয়, নয় বা কোথাও ক্ষণিকের অতিথি হওয়া ; লেফাফা পোশাক না মানলে চলে কই ? ঊর্মিলা ঠিকই বলেছে। যে ব্রতে যে কথা।

'হাসপাতাল অনুমতি না দিলে প্রাইভেটে যেতে পারি না।' ঊর্মিলা সরল মুখে বললে। 'শেষে শেষ-সলতে চাকরিটাও খসে যাক আর কি।'

'তা হলে ঠিক মতন ডাকলে ঠিক মতন আসবে ? মানে যদি ঠিক ছন্দ ধরে ডাকি ঠিক ছন্দ ধরে আসবে ?'

'নিশ্চয়।' ঝুঁকে পড়ে কাগজে ঠিকানা লিখে দিল ঊর্মিলা। 'এই বাড়ির ঠিকানা, আর এই হাসপাতালের। অসুখ হয়েছে সাব্যস্ত হলে ঠিক চলে আসব। কিন্তু তার আগে—' ঊর্মিলা এগোলো দরজার দিকে।

চেয়ার থেকে উঠে হিমাদ্রি দু'পা গেল এক সঙ্গে। বললে, 'আমার অসুখটা বুঝি এখনও সাব্যস্ত হয় নি ?'

'না। কাগজে-কলমে হয় নি।' যেতে-যেতে থামলো ঊর্মিলা : 'কিন্তু তার আগে, মনে থাকে যেন—কাগজে-কলমে আপনার অর্ডার চাই।'

উপানন্দ বদলি হল আরেক কোর্টে। লোকে ভাবলে শাস্তি দেওয়া হল বুঝি, কিন্তু শহরের মধ্যেই আরেক কোর্ট, আর তার এমন এক বন্দর, যেখানে সপ্ত ডিঙ্গাতেই মধু—জান্তা লোকেদের বুঝতে দেরি হল না।

'এ কী হল ? এটা কী করলেন ?' বীরেশ আবার একদিন মারমুখো হয়ে ঢুকল খাসকামরায়।

'কেন, বদলি করে দিয়েছি।'

'বদলি একটা শাস্তি?'

'কী শাস্তি না-শাস্তি তা আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে নাকি?' ক্রুদ্ধ হল হিমাদ্রি। 'বিচার আমি করছি আপনি নন।'

'আমি এবার ফৌজদারি করবো।'

'একশো বার করুন। তা এখানে তম্বি করছেন কেন?' কলিং বেল বাজালো হিমাদ্রি।

বীরেশ বুঝলো এটা বিতাড়নের গর্জন। ঘর ছেড়ে চলে যেতে-যেতে বললে, 'আর কেন, কিসের জন্যে ছাড়ান পেল উপানন্দ তাও বার করে ফেলবো।'

কলিং বেলে ঝড় তুললো হিমাদ্রি।

'এবার ঘুষের মামলায় কে পড়ে দেখে নেব নিঘ্‌ঘাত।' হিংস্র ইঙ্গিত ছুঁড়ে অদৃশ্য হল বীরেশ।

ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যেতে কতক্ষণ—ছুটির দরখাস্ত করলো হিমাদ্রি।

তার আগে একবার ঊর্মিলার খোঁজ নিতে হয়। তার মানেই উপানন্দের খোঁজ। সেরেস্তাদারকে ডাকলো।

'উপানন্দের বিরুদ্ধে সেই ফৌজদারির কী হল?'

'বা, সে মামলা তো তুলে নিয়েছে, ডিসচার্জ হয়ে গিয়েছে উপানন্দ।' বললে সেরেস্তাদার।

'সে কি? এত তেজ নিবে গেল? কী ব্যাপার?'

'ফোন করবো?'

'দেখুন তো—'

ফোন করে জানা গেল উপানন্দ ছুটিতে আছে। ক্যাজুয়েল লিভ। কেন ছুটি তা আর কী জিগগেস করবে। হয়তো অসুখ বিসুখ করেছে।

নিজেই খোঁজ নেবে হিমাদ্রি। ছুটি মঞ্জুর হয়ে এলে ডাকবে ঊর্মিলাকে। হাসপাতাল থেকে কী করে সহজেই অনুমতি পাওয়া

যাবে তারও অন্ধিসন্ধি নিতে হবে। দরকার হলে চাঁদা দেবে হাসপাতালে আর অগ্রিম দাদন উর্মিলাকে।

ফৌজদারি মামলা যখন আর নেই তখন বীরেশ তো পরাভূত।

ঠিকানা চিনে সন্ধ্যার দিকে উপানন্দের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল হিমাদ্রি।

এ কি, তার বাড়িতে যে বিয়ে!

'কার বিয়ে?'

'আর কার! উর্মিলার।'

'সে কি? নার্সেরও বিয়ে হয়?'

'হয় বই কি। মাথায় অন্য রকম হুড দেয়। অন্য রকম ফণা তোলে। দেখবেন আসুন।'

'আর, বর কই? এসেছে?'

'এসেছে।'

'কী, রুগী নাকি?'

'না। ঘুষখোর। দেখবেন আসুন।'

বর আর কে। বর বীরেশ।

॥ একমাত্র ॥

'তারপর কী হল ?'

'চোর বাথরুম থেকে বেরুল।'

'হাতে ছোরা ?' রোগা চোখ বড় করে তাকালো শোভন।

'প্রকাণ্ড ছোরা। বাঘের জিভের মত লকলক করছে।'

'কটা চোর, মা ?'

'কটা আবার! একটা। বেশি হলে তো ডাকাত হয়ে গেল।'

'তারপর ধরা পড়লো, মা ?'

'নিশ্চয়। ধরা না পড়লে গল্প কী।'

'বলো, বলো মা, খুব মজা। প্রথম থেকে বলো।' সুজাতার বুক ঘেঁষে আসতে চাইলো শোভন।

সেই জন্যে ভূতের গল্প একদম শোভনের ভালো লাগে না। ভূত অনেক অদ্ভুত কাণ্ড করে বটে, ভয়ও খুব পাওয়া যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্যান্ত ধরা পড়ে না। মিলিয়ে যায় হাওয়া হয়ে। আর, যে-সব ভূত ভূত নয়, ফাঁকি, ছদ্মবেশী, সেগুলো একটুও সুবিধের নয়। ধরা পড়লে মানুষই ধরা পড়লো, ভূত নয়।

তারই জন্যে চোরের গল্পই মজার। চোর ধরার গল্প।

'রাত্রের ট্রেনে উঠেছে স্বামী-স্ত্রী, সঙ্গে ছেলে-মেয়ে, চার বার্থের কামরা সম্পূর্ণ রিজার্ভ করা। উঠেই বিছানা-টিছানা করে শুয়ে পড়েছে সবাই—ছেলে-মেয়ে উপরের দুই বার্থে, আর নিচে এক বেঞ্চিতে স্বামী, আরেক বেঞ্চিতে স্ত্রী—'

'ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার নাম বলো, মা—' কিছু অস্পষ্ট থাক আড়ালে থাক এ মোটেই পছন্দ করে না শোভন।

'ধরো, ভদ্রলোকের নাম ভুবনমোহন আর ভদ্রমহিলার নাম ব্রিজনবালা।'

'আর – ছেলেমেয়ের ?'

'ওদেরও নাম বলতে হবে ?'

'যদি দরকার না থাকে তো বোলো না।'

'না, না, ছেলের নামটা বলতে হবে বইকি। ছেলের নাম প্রবীর।'

'ছেলেটা বুঝি কিছু করেছিল ?' রোগা চোখ আবার বড় হল শোভনের।

'বা, করেছিল বই কি। ছেলেটাই তো আসল।'

খুব খুশি হল শোভন। বললে, 'কত বয়স মা ছেলেটার ?'

'এই তোমার বয়সী। নয়-দশ বছর।' শোভনের কপালে চুলে একটু হাত বুলিয়ে দিল সুজাতা।

'নয়-দশ বছর ?' মায়ের গা ঘেঁষে আবার সরে আসতে চাইলো শোভন।

কিন্তু কী জানি কেন পারলো না এগোতে।

মনে হয় কী যেন এক অদৃশ্য ব্যবধান শুয়ে আছে তার আর মা'র মধ্যে। কিছুতেই যেন মা'র বুকের মধ্যে, মা'র কোলের মধ্যে ডুবে যেতে পারে না। আগে-আগের কথা মনে নেই, খুব শিশুকালের কথা, কিন্তু যতদূর মনে করতে পারে, সবল-সমর্থ হবার পর থেকে মা আর তাকে টেনে নেয় নি বুকের মধ্যে! যেন কোনদিনই নেয় নি। হাত বাড়াতে গেলে বলেছে, তুমি এখন দিব্যি বড় হয়ে উঠেছ না ? বড় হয়ে উঠেছি বইকি। কিন্তু কতদিন অসুখে ভুগছি বল তো ? রোগা ছেলে, মা'র কাছ থেকে একটু ঘন, গাঢ়, দ্রব, একটু উচ্ছ্বসিত আদর পাবে না ?

'হ্যাঁ, বয়সে কী হয় ? সাহসই আসল।' সুজাতা বললে,

'সাহস ছিল প্রবীরের। রোগাপট্‌কা ছেলে, কিন্তু কী কাণ্ডটা করলে!'

'কী করলে? বলো মা বলো—'

'রাত, ট্রেন চলেছে হু-হু শব্দে, চার বার্থে চারজন। এদিকে খুব সতর্ক, উপরে-নিচে দরজার ক্লাচ ফেলা। নিটুট নির্ভয়ে ঘুমুচ্ছেন সকলে। কিন্তু বাথরুমটাই খুলে দেখেন নি কেউ—'

'সে কী কথা?' সে কক্‌খনো হতে পারে?' অসম্ভবের ছোঁয়াচ-লাগা কাহিনী মানতে চাইবে না শোভন: 'বা, শোবার আগে বাথরুমের দরকার হয় নি কারু?'

'না, না,' সামলে নিল সুজাতা। 'গোড়ায় যখন ওরা শুতে যায়, খালি ছিল বাথরুম। মাঝপথে ঢুকেছে পাশের জানলা দিয়ে।'

'সে অসম্ভব। ওভাবে ঢুকবে কি করে?'

'জানো না বুঝি কী হয় আজকাল!' কাহিনী রোমাঞ্চকর করলো সুজাতা: 'একটা সরু-করে-বাঁধা বিছানা বার্থের তলায় অন্ধকারে ঢোকানো থাকে। সমস্ত মেঝেময় মালপত্র ছড়িয়ে রাখতে প্যাসেঞ্জাররা ব্যস্ত, লুকোনো বিছানাটা লক্ষ্যও করে না। লক্ষ্য করলেও সন্দেহ করে না। ভাবে, নিজেদের না অন্য কারু হবে হয়তো। এ হারানো বিছানার মধ্যে ছোট্ট একটা ছেলে লুকোনো থাকে, চোরেদের ছেলে। গাড়ি কোথায় স্লো করবে জানা আছে, সে জায়গায় ছেলেটা বিছানা থেকে নিভুর্ল বেরিয়ে এসে টুক করে দরজার ক্লাচ খুলে দেয়। নিজে নেমে যায় বিছানা নিয়ে আর চোর উঠে আসে—'

'তাই! তাই হবে!' শোভনের বিচিত্র কল্পনা তৃপ্তি পায়। 'অমনি বিছানা-বাঁধা ছোট্ট একটা ছেলেই ছিল বেঞ্চির নিচে। তাক বুঝে ও-ই খুলে দিয়েছে দরজা। চোর ঢুকে পড়ে প্রথমে লুকিয়েছিল বাথরুমে। গাড়ি স্পিড না নিলে তো বেরুনো ঠিক হবে না। তারপর বলো—' মার মুখের দিকে তাকালো শোভন।

'তারপর ছোরা হাতে বেরিয়ে এল চোর। একটা আলো জ্বালালো।

বিজনবালার কাছে গিয়ে তার বুকের উপর ছোরার ডগাটা চোখা করে রেখে বললে, গলার হারটা খুলে দিন। বিজনবালা তাকিয়ে দেখলো, যেমন প্রকাণ্ড লোক তেমনি তার হাতে প্রচণ্ড ছোরা! চেঁচিয়ে উঠলো। চেঁচিয়ে কিছু লাভ হবে না, বললে চোর, কেউ শুনবে না চলন্ত গাড়িতে। ভালোমানুষের মত খুলে দিন। নইলে আপনার ছেলেমেয়ে স্বামী—দেখছেন আমার হাতে?

চেঁচামেচি শুনে জেগে উঠলেন ভুবনবাবু। তিনি এ দৃশ্য দেখে গায়ের কাপড়টা আরো পুরু করে টেনে দিলেন মাথার উপর। শুধু বললেন, প্রাণে মেরো না, নিয়ে যাও গয়নাপত্র। স্ত্রীকে বললেন, খুলে দাও।

বিজনবালা হার খুলতে দুহাত তুললো ঘাড়ের কাছে। চোর দেখলো দুহাতভরা সোনার চুড়ি।

বললে, ওই চুড়িগুলিও খুলে দিন।

হার খুললো, চুড়ি খুললো বিজনবালা।

চোর এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। বললে, আরও আছে?

আছে—।

কোথায়?

বাক্সে।

বাক্স কোথায়!

ট্রাঙ্কের মধ্যে।'

'চোরটার খুব বেশি লোভ, মা।' বলে উঠলো শোভন।

'হ্যাঁ, অতি লোভেই তো ধরা পড়লো।' বললে সুজাতা।

'তারপর?'

'তারপর চোর বললে, খুলুন ট্রাঙ্ক। মেঝের উপরে ট্রাঙ্ক, বিজনবালা ডালা তুলে বাক্স বার করলো। বাক্সের মধ্যে চূড়-আর্মলেট-কলার-কান—আরো অনেক গয়না। বোনঝির বিয়ে থেকে ফিরছিল কিনা, তাই অত জাঁকজমক। খুলে খুলে রাখতে লাগলো সিটের উপর। চোর

বললে, একটা রুমালে করে বাঁধুন একসঙ্গে। বার করুন রুমাল। খোলা ট্রাঙ্ক থেকে একটা রুমালও বার করলো বিজন। দুহাত কাঁপছে, রুমাল কিছুতেই বাঁধতে পারছে না, গয়না কেবল এদিক-সেদিক বেরিয়ে যাচ্ছে ছিটকে, ছড়িয়ে পড়ছে। যত দেরি হচ্ছে ততই অস্থির হচ্ছে চোর। কী, বাঁধতে পারছেন না তাড়াতাড়ি? ধমকে উঠলো চোর। ধমক খেয়ে বিজনবালার আঙুল আরো কাঁপতে লাগলো। দাঁড়ান, আমি বাঁধছি। বলে চোর দুহাতে বাঁধতে লাগলো—'

'দুহাতে?' বিস্ময়ের টান শোভনের প্রশ্নে।

'একহাতে বাঁধে কি করে? আর নিচু হয়ে বাঁধতে গিয়ে ছোরাটা একটুখানি, একমুহূর্তের জন্যে রাখলো একপাশে, সিটের উপর। আর, চক্ষের পলক ফেলার আগে চকিত আধমুহূর্তের মধ্যে নিদারুণ কাণ্ড ঘটে গেল—'

'কি মা?'

'বিজনবালা ছোরাটা তুলে নিয়ে খোলা জানলা দিয়ে টুক্ করে ফেলে দিল বাইরে। আর, কী হল আয়ত্ত হতে দেবার আগেই বিজনবালা দুহাতে সমস্ত শক্তি এনে চোরটাকে প্রবল ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল দেয়ালে। ভুবনবাবু উঠে পড়ে তখনো ভয়ে বুঁ-বুঁ-বুঁ করছেন, কিন্তু প্রবীর বসে নেই। চোর উঠে ফের মায়ের দিকে এগিয়ে যেতেই সে চোরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ছেলের কাণ্ড দেখে ভুবনবাবু তখন সাহস পেলেন, হাত মেলালেন। পাঁচ ব্যাটারির লম্বা টর্চ ছিল, তাই নিলেন কুড়িয়ে। চোরের হাতে অস্ত্র নেই, যত বলবানই হোক তিন-তিনজনের সঙ্গে সহসা তার পারবার কথা নয়, আর ছোট্ট মেয়ে, অতসী, দিলে ঘ্যাঁচ করে শেকল টেনে।'

'ট্রেন থেমে গেল?' বিছানা ছেড়ে শোভন প্রায় উঠে বসে আর কি।

'থেমে গেল।'

'আর চোর?'

'মুখের উপর টর্চের বাড়ি মেরে জখম করেছেন ভুবনবাবু, পারলো না পালাতে। ধরা পড়লো।'

'ধরা পড়লো? কী মজা! আর গয়না, গয়নার কী হল, মা?'

'গয়না অটুট আছে। নিতে পারে নি।'

'বিজনবালার যে হাত কাঁপছিল, মা, সেটা ওর চালাকি? যাতে রুমাল বাঁধতে না পারে। যাতে চোর ছোরার থেকে হাত আলগা করে নেয় একটুখানি। তাই না?'

'না, না, ভয়েই কাঁপছিল বিজনবালা। আর, ছোরা জানলা দিয়ে ফেলে দিলেই বা কি, চোর একঘুষিতে বিজনবালাকে কাবু করে থাবা দিয়ে যা রুমালে ছিল তাই নিয়ে শেকল টেনে গাড়ি থামিয়ে পালিয়ে যেতে পারত। আসল কেরামতি প্রবীরের। ওরই অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়াতেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল চোর। প্রস্তুত হতে পারলো না, ঘোর কাটতে না কাটতেই টর্চ এসে মুখে পড়লো।'

'সত্যি কী বীর ছেলে প্রবীর! আমার বয়সী, না মা?'

'হ্যাঁ। গল্প বলা হল—'

'খুব সুন্দর গল্প।'

'এবার তবে ঘুমোও।'

দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে পড়লো শোভন।

সুজাতাও চোখ বুজলো। কিন্তু আসে কই? আসে কই ঘুম?

কে যেন আসবে, কে যেন আসবে, প্রতি দিন রাত্রি সে অপেক্ষা করছে। নিঃশব্দ পদক্ষেপ শোনবার জন্যে কান পেতে আছে সর্বাঙ্গে।

আজও এল না।

এ মাসের তারিখটাও পেরিয়ে গেল।

আবার আরেক মাস!

খুট খুট খুট—কড়া নাড়া নয়, দরজার পিঠে আঙুলের গাঁটের শব্দ।

উঠে দরজাটা খুলে একটু ফাঁক করতেই দেখলো, ইন্দ্রনীল।
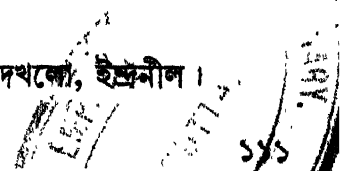
আনন্দে-আতঙ্কে মিশে কণ্ঠস্বর ঝাপসা হয়ে এল সুজাতার: 'তুমি?'

'হ্যাঁ, এলাম তোমার কাছে।'

রুগীর ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, তাকে পাশের ঘরে নিয়ে এল সুজাতা।

'বসো।'

সোফায় বসে জিগগেস করল ইন্দ্রনীল, 'পাশের ঘরে কে শুয়ে আছে দেখলাম।'

'আমার ছেলে।'

'তোমার ছেলে? মানে, তোমার পেটের ছেলে?'

'না। আমার স্বামীর প্রথমপক্ষের ছেলে।'

'তাই বল।' হেসে উঠল ইন্দ্রনীল: 'তুমি তো এখনও ধরো নি একটাও?'

'মানে?'

'মানে, পেটে ধরো নি। জননী হও নি।'

'তুমি কি কাঠখোট্টা কথা বল!' হাসলো সুজাতা।

'আগে আগে যখন তোমার সঙ্গে প্রেম করতাম তখন কি রকম ঘুরিয়ে-ঘারিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলতাম, বাক্যকে কাব্য করে-করে—কী বোকাই যে ছিলাম! তোমার দিকে তো দেখতাম না, কেবল কথার দিকে দেখতাম—নারীর সৌন্দর্য না কথার সৌন্দর্য—অমূল্য সময় কী ভাবেই যে অপচয় করেছি—'

'এখন বুঝি আর কর না!' ভয়ের সঙ্গে লজ্জা, চোখে নতুন রং ফেলে তাকালো সুজাতা।

'না। এখন পষ্টাপষ্টি দেখি। দূরবীক্ষণে নয়, অণুবীক্ষণে দেখি।' আদি-অন্ত দেখলো ইন্দ্রনীল। বললে, 'তাই বলতে পারি হয় নি এখনও কিছু—'

'হয় নি।'

'তাই ওকে তোমার ছেলে বোলো না। কি না জানি তোমার

স্বামীর নাম—প্রিয়ব্রতবাবু—প্রিয়ব্রতবাবুর ছেলে বলো।' ইশারা করল পাশের ঘরে: 'কী হয়েছে ওর? শুয়ে আছে দুপুরবেলা?'

'অসুখ করেছে।'

'কী অসুখ?'

'কি জানি কি। অনেকদিন ধরে একটানা জ্বর।' উদ্বেগের কুয়াশা সুজাতার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

'কী বলছে ডাক্তার?'

'কিছু ঠিক বুঝতে পারছে না। আর কোনও উপসর্গ নেই, শুধু একটু যা দুর্বল হচ্ছে দিন-দিন।'

'বিছানায় শোয়া?'

'একটু আধটু হাঁটতে-চলতে পারে, কিন্তু শুইয়েই রাখি সারাক্ষণ। তাই ডাক্তারের আদেশ।'

'চেঞ্জে নিয়ে যাও।' সোফার মধ্যে নড়েচড়ে উঠল ইন্দ্রনীল।

'ডাক্তারও তাই বলছে।'

'হ্যাঁ, চেঞ্জই একমাত্র চিকিৎসা। আমাদেরও চিরন্তন এই জ্বর— অভ্যাসের জ্বর, কিছুতেই যাচ্ছে না গা থেকে। ক্লান্ত শীর্ণ দুর্বল করে ফেলছে। তাই চেঞ্জ, চেঞ্জ দরকার। একটা কিছু অনভ্যাসের বিস্ময়, নতুনত্বের আস্বাদ। তা চেঞ্জে কোথায় যাবে?'

'এখনো কিছু ঠিক হয় নি। ওঁর ছুটি পাওয়া নিয়েই গোলমাল। মস্ত অফিস, তার সর্বময় কর্তা—' অলক্ষ্যে স্বামীর একটু প্রশংসা করে ফেলল সুজাতা।

'ওই মস্ত অফিস আর মাইনে আর কৃতিত্বই দেখলে।'

'কিছু একটা দেখতে হবে তো?' চোখ নামাল সুজাতা।

'তা তো ঠিকই। ফেরে কখন অফিস থেকে?'

'সন্ধ্যে হয়ে যায়।'

'কী নিয়ে তবে আছ?'

'কেন, ছেলে আছে।' আমার-টুকু বলতে পারল না সুজাতা।

'সে তো আছে একটা খেলার পুতুল—দিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে রেখেছে। নাড়ছ চাড়ছ সাজাচ্ছ গোজাচ্ছ, কিন্তু যখন একদিন থাকবে না?'

'থাকবে না মানে?' প্রায় আঁতকে উঠল সুজাতা।

'মানে, ইস্কুলে-টিস্কুলে যায় তো? স্বামী অফিসে, ছেলে ইস্কুলে—তখন দুপুরবেলা কী নিয়ে থাকো?'

'কেন, ফিরে-আসার আশা নিয়ে।' অদ্ভুত করে হাসল সুজাতা।

'ওই আশা নিয়ে থাকো। খালি বেশিই দেখতে গেলে। আশাও বেশি-বেশি নিয়ে থাকো। স্বামীর সবই যখন বেশি তখন বয়সও নিশ্চয় বেশি।' হাসতে হাসতে উঠে পড়ল ইন্দ্রনীল: 'কিন্তু জানো, তুমি তেমনিই আছ।'

'বলো কি, আমারও তো ছ-সাতবছর বিয়ে হল—বয়েস কি আর থেমে থাকে?'

'আগে সুন্দর ছিলে, এখন লোভনীয় হয়ে উঠেছ।'

'তার মানে, আগে তুমি বিলাসী ছিলে এখন সন্ন্যাসী হয়ে উঠেছ—' মুচকে হাসল সুজাতা।

'আজ যাই। ছেলের অসুখ। তোমার মন উচাটন।'

'না, না, ও তো ঘুমুচ্ছে। আরও একটু থাকো না।'

'না, আজ যাই। ছেলে ঘুমুচ্ছে, জাগবে সেই আশা, ওর বাপ অফিসে, ফিরবে সেই আশা—আশা নিয়েই থাকো।' সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল ইন্দ্রনীল।

'আমার সর্বত্র আশা। তুমিও আমার ফিরে-আসার আশা।'

ইন্দ্রনীল চলে গেলেও স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল সুজাতা।

'মা! মা!' কেঁদে উঠেছে শোভন।

সুজাতা চলে গেল পাশের ঘরে।

'তুমি কোথায় ছিলে মা? পাশের ঘরে? সেখানে কী?' শোভন

ফোঁপাতে লাগল: 'তুমি আমার কাছে থাকো, আমার পাশ ঘেঁষে শুয়ে থাকো।'

'ঘুমোও, ঘুমোও।' ধমকে উঠল সুজাতা। 'ডাক্তার বলে গেছে বেশিক্ষণ ঘুমোতে, তা একটু পরে-পরেই জেগে ওঠা। অবাধ্য ছেলে, মন্দ ছেলে, বাজে ছেলে, নিজে শুধু ভুগছে না, সবাইকে জ্বালিয়ে মারছে। আমার কি আর কাজকর্ম নেই, আমার কি আর আশ-পাশের ঘর থাকবে না?'

চোখ বুজল শোভন। মা যখন বকে তখন কী নির্মমের মত বকে। তখনই মনে হয় মা'র বুক যেন পাথরবাঁধা, কোল যেন বিদেশ। এখন অসুখে-পড়া বলে না হয় মারে না, ভালো-থাকা অবস্থায় কত দিন মেরেছে কথা না শুনলে। তখন মনে হয়েছে সে যেন আর কেউ। পরের পর, দূরের দূর। ইচ্ছে করেছে চলে যাই আর কোথাও।

শোভনের পাশেই শুল আবার সুজাতা। যখন আর থাকবে না—দিব্যি বলে গেল ইন্দ্রনীল। আশ্চর্য কি, যদি না সেরে ওঠে! কী করতে পারে সে তাহলে? মানুষের কী সাধ্য? সে কাঁদবে নিশ্চয়ই, কে বা না কাঁদবে, কিন্তু কোথাও কম পড়বে নিশ্চয়।

হ্যাঁ, তার নিজস্বকে চাই। যে তার সারের সার সত্তার সত্তা। যাকে বুকে কোলে পেলেও ষোল আনা, হারালেও ষোল আনা।

শোভনের দিকে তাকাল। শস্যের মাঠে একটা পাখিতাড়ানো খড়ের মূর্তি। তার বিদ্রোহের বিরুদ্ধে অবরোধ। তার অসন্তোষের প্রতিষেধ।

সন্ধ্যের দিকে ফিরল প্রিয়ব্রত।

'কেমন আছে শোভন?'

'ভালো আছে। ঘুমিয়েছে।'

'সেই গল্প শুনে ঘুম—'

'তাও আবার চোরের গল্প—চোরধরার গল্প—'

স্বামীকে আবার নতুন করে দেখল সুজাতা। হলই-বা না বয়স

একটু বেশি, কিন্তু কী দৃপ্ত পুরুষালি চেহারা। সবল উন্নত দৃঢ়। তৃপ্তিতে শান্তিতে ভরপুর। তবে কোথায় ত্রুটি? কোথায় অপূরণ? কে জানে তার নিজের ত্রুটি কিনা। বাপের-বাড়ির স্ত্রী-আত্মীয়াদের পাল্লায় পড়ে ডাক্তারও দেখিয়েছে সুজাতা। দস্তুরমত সুস্থ, নির্মল।

তবে কেন ঠিক মিশ খাচ্ছে না? কেন দড়ির দুই প্রান্ত একত্র হচ্ছে না?

হঠাৎ মনে হল সুজাতার, সব আছে, মন নেই। রক্ত আছে মাংস আছে, ভালবাসা নেই। ফুল, বৃন্ত, কোষ সব আছে, গূঢ়তম কেন্দ্রে মধুটি নেই। কথা আছে, ছন্দ আছে, কল্পনা আছে, সুরটুকু নেই, গুনটুকু নেই।

মনের কী দরকার, বিজ্ঞান কি মন দেখে? আগুনে হাত রাখলে হাত পুড়বেই, সে দোষীরই হোক, নির্দোষেরই হোক। রক্তে বিষ পড়লে রক্ত নীল হয়ে যাবে, তা স্বেচ্ছায়ই পড়ুক বা অনিচ্ছায়।

কিন্তু কে জানে মানুষের মনও হয়তো বিজ্ঞান। ভালো মন না নিয়ে দান করলে সে জিনিস ফল দেয় না। পুণ্য না থাকলে জল আসে না পুকুরে। বিজ্ঞানে বাক্য হয়, কবিতা হয় না। একমাত্র আন্তরিকতাতেই কবিতা হয়।

মন নেই। যতক্ষণ শোভন আছে ততক্ষণ বোধহয় মন জাগবে না। সুজাতা ঠকবে। ঠকতে থাকবে।

'জানো বাবা, মা আজ আমাকে খুব বকেছে।'

'কেন?'

'ঘুমুতে দেরি হচ্ছিল বলে—'

'দেরি হচ্ছিল?'

'না, ঠিক দেরি নয়, ঘুম ঠিক এসেছিল, কিন্তু জানো, স্বপ্ন দেখলাম যেন ঘরে চোর এসেছে। পা টিপে টিপে হাঁটছে, ফিসফিস করে কথা কইছে, তাই চট করে ঘুমটা ভেঙে গেল—'

'অত সব চোর ডাকাত ডিটেকটিভের গল্প শোন, তাই মাথা গরম থাকে, ঘুম আসে না—এলেও গাঢ় হয় না—'

'তাই আমাকে বকবে? বাজে ছেলে বলবে?'

'ও কিছু নয়। তোমার মা তো!'

'জানো, একেক সময় মা আমাকে দূরছাই দূরছাই বলে—'

'তোমাকে বলবে কেন? তোমার অসুখকে বলে।' প্রিয়ব্রত ছেলের হাতে হাত বুলিয়ে দেয়ঃ 'আর মা যাই বলুক না, মা বললে কী হয়?'

'না বাবা, তুমি জানো না, মা আমাকে ভালবাসে না, গা স্পঞ্জ করার সময় হাতে-পিঠে এমন লাগিয়ে দেয়—'

'আহাহা।' এবার পিঠে হাত রাখে প্রিয়ব্রত। 'খুব রোগা হয়ে গেছ কিনা তাই একটু-আধটু লেগে যায়—'

'বলে, আর পারি নে! আর পারি নে!'

'কত তোমাকে যত্ন করছে বলো তো—'

'একটুও আমাকে কোলে করে না মা, কাছে টেনে নেয় না।'

'না, না, নেবে বই কি। ডাক্তারই তো বেশি নড়াচড়া করা বারণ বলে গেছে।'

হঠাৎ ঘরে সুজাতার পা পড়ল। ভয়পাওয়া মুখে স্তব্ধ হয়ে গেল শোভন।

এ নিয়ে সুজাতাকে কী বলবে, কী বলা যায়! সুজাতা প্রাণপণ করছে, নিজে পেটে ধরলেও বা এর চেয়ে কী বেশি করত, কী বেশি করা যায়! উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর কেমন জুড়িয়ে গেছে, মনে একটুও লঘুতা নেই, চোখের কোলে ভয়ের কালো যেন পুরু করে পোঁচ দিয়েছে। কতদিন বাদে সেই সেদিন পুরনো কলেজের ফাংশনটায় শুধু গিয়েছিল—তাও পুরনো দিনের মায়ায়, প্রিন্সিপ্যালের অনুরোধে—নইলে এক সন্ধ্যা সিনেমায় পর্যন্ত যায় না। পরদায় কত তারা ঝিকিয়ে গেল, কত হীরা বিকিয়ে গেল—তবু এতটুকু চাঞ্চল্য নেই

সুজাতার। ছেলের অসুখ—আমার কি বেরুনো চলে? বাড়িতে মাঝে-মাঝে কত উৎসবের দিন আসে, ফিরিয়ে দেয় সুজাতা ; বলে, আমার ছেলের অসুখ, আমার কি এখন ফুর্তি করার সময় আছে, না মানায় আমাকে হৈচৈ! আমার ছেলে আগে ভালো হোক।

কিন্তু শোভন কি সত্যিই ভালো হবে? হলেই বা, কে জানে, কবে? তাকে একেবারে ক্ষয় করে ফেলে, ফতুর করে দিয়ে?

তারপরেও যদি ভালো না হয়!

ঘরময় সমস্ত শূন্যতা দস্যুর হাতে যেন তার টুঁটি টিপে ধরল।

আর, ভালো হলেই বা কি।

যত বড় হবে ততই দূরে চলে যাবে শোভন। ততই স্পষ্টতর করে বুঝতে শিখবে সে তার পর, তার নিঃসম্পর্কের। একটি উদাসীন সম্ভ্রম দিলেও দিতে পারে বা—ক্রমে ক্রমে সেটা ঠাণ্ডা অবহেলায় এসে দাঁড়াবে। তারপর প্রিয়ব্রত যদি তার আগে মরে, যতই কেন না সে রেখে যাক দিয়ে যাক, ছেলের সামনে সুজাতাকে মনে হবে অনধিকারিণী, যেন ভিখারিনী হয়ে রাজ্য জুড়ে বসেছে। কে জানে হয়তো মামলা হবে শোভনের সঙ্গে। আর সে এমন মামলা নয় যে সুজাতা তা ছেড়ে দেবে। দুজনেই লড়বে নখে দাঁতে।

ছি, ছি, তার নিজের জিনিস কই? তার রক্তের রক্ত তার মজ্জার মজ্জা তার নির্যাসের নির্যাস।

'গল্প বলো, মা।' পরদিন দুপুরে যথারীতি আবার বায়না ধরেছে শোভন, 'আরেকটা নতুন চোরের গল্প।'

'পালিয়ে গেলে চলবে, না ধরা পড়বে?'

'ধরা পড়বে।'

'বুড়োবুড়ি স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুয়েছিল খাটে, ঘরে চোর ঢুকেছে।' গল্প বলতে লাগল সুজাতা: 'বুড়ো লোহার সিন্দুকের চাবিটা নিজের বালিশের তলায় না রেখে বুড়ির বালিশের তলায় রেখেছে, আর নিজের বালিশের তলায় রেখেছে একটা মিথ্যে চাবি।

জানে চোর ঘরে ঢুকে চাবির জন্যে বুড়োর বালিশের নিচেই হাত দেবে। হাত দিয়ে যা পাবে তা দিয়ে চোরের হয়রানির আর শেষ থাকবে না। সিন্দুক খুলতে খুলতে রাত কাবার।

চাকরের কাছ থেকে খবর পেয়েছে চোর—মানে, চাকরের সাকরেদই চোর—বুড়োর বালিশের নিচেই চাবি। বুড়োর কারসাজি চাকর জানত না, তাই চোরও জানে নি। কিন্তু বুড়োর চালাকি আরো সূক্ষ্ম।

চোর ঘরে ঢুকে গুটিগুটি এগুচ্ছে বিছানার দিকে, বুড়ো মেকি চাবিটা টুং করে মেঝের উপর ফেলে দিল। চোর ভাবলো, ঘুমের আগোছালে বালিশের তলা থেকে বেরিয়ে এসে লোহার সিন্দুকের চাবিটাই বুঝি পড়লো। মেঝেময় হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল। এ চোর, ডাকাত নয়, তাই সঙ্গে কোন অস্ত্রও নেই আলোও নেই—থাকলেও তার ব্যবহারের ক্ষেত্র এখনো তৈরি হয় নি। চাবি খাটের তলায় ছিটকে চলে গেছে মনে করে নিচু হল চোর, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে গেল খাটের তলায়। আর যায় কোথা!'

'কি হল, কি হল, মা?'

'শীতের রাত, বুড়ো গায়ের লেপ নিয়ে চোরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়তেই লেপের নিচে চলে গিয়েছে চোর, আর তার উপরে বুড়ো, তাকে জাপটে ধরে চেঁচাচ্ছে তারস্বরে! বুড়িও বসে নেই। সেও তার লেপ দিয়ে বুড়োর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। লেপের উপরে লেপ, চোরের তখন অন্ধকূপ! চিৎকারে লোকজন জড়ো হল, ধরা পড়ল চোর।'

খুব আনন্দ শোভনের। ঠিক সময়ে নির্ভুল ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে অনেক চোরই কুপোকাত!

'আর নয়, এবার ঘুমোও—' পাশে শুয়ে মাথায় চুলে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগলো সুজাতা।

ইচ্ছে হল মা'র একখানা হাত তার গায়ের উপর থাকে। ইচ্ছেটা উঠতে-উঠতেই ধীরে ধীরে ডুবে গেল ঘুমের মধ্যে।

সেই হাত ধরেছে ইন্দ্রনীল। সেদিনের কথাই ভাবছে সুজাতা।

'তোমার কলেজের ফাংশনে যে এলাম, কেন জানো?' বললে, ইন্দ্রনীল, 'জানতাম তুমি আসবে।'

'কবে ফিরেছ?' চোখে বন্দনার আলো জ্বেলে তাকাল সুজাতা।

'এই তো দিনকয়েক।'

'কী করছ এখন? নিশ্চয়ই বড় একটা কিছু···'

'কেন, আমার চেহারা তাই বলছে?'

'তা তো বলছেই। তাছাড়া নিমন্ত্রিত জনতার একেবারে প্রথম শ্রেণীর মধ্যকার চেয়ার তোমার—'

'ও কি একটা আসন নাকি? যদি তোমার হৃদয়াসনে—' হাত ধরল ইন্দ্রনীল।

'বা, সে তো আছই।' কুমারীর মতন চোখে তাকাল সুজাতা। 'কিন্তু এমনি আছ কোথায়?'

কার্ড দিল ইন্দ্রনীল। পদ, পদবী, ফোননম্বর, ঠিকানা সব আছে।

সুজাতারই যাবার কথা, উলটো, ইন্দ্রনীলই এসেছে। মেঘের বুকে বিদ্যুৎ যেমন আসে।

ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক।

উদ্বেল হয়ে দরজা খুলে দিল সুজাতা।

পাশের ঘরে নিয়ে গেল ইন্দ্রনীলকে। ইন্দ্রনীল আজ যেন স্পষ্ট হয়ে এসেছে—কুয়াশার আড়াল চলে গিয়েছে সূর্যের মুখ থেকে।

'তুমি কী ভীষণ তাড়াহুড়ো করলে বলো তো!' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ইন্দ্রনীল বললে।

'আমি? কবে? কাল? তুমিই তো বরং—' লম্বা সোফাটায় বসল সুজাতা।

'না, কালকের কথা বলছি না, সেদিনের কথা বলছি।'

'সেদিনের কথা!' যেন একটু আশ্বস্ত হল সুজাতা।

'আমাদের ভালবাসা আমাদের সেদিন বিয়ের ঘাটে পৌঁছে দেবার

আগেই আমার ভাগ্যের নৌকো আমাকে নিয়ে গেল বিদেশে।' পাশের কৌচে বসে বলতে লাগল ইন্দ্রনীল: 'আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যানও করি নি, ফিরে আসবও না বলি নি, ভালবাসাটা প্রবল করবার জন্যেই দূরে গেলাম ক'দিনের জন্যে আর তোমার তর সইল না—' দুচোখে গঞ্জনা পুরে তাকাল ইন্দ্রনীল।

'কি রকম সব অস্পষ্ট হয়ে গেল, অসার্থক হয়ে গেল।' অপরাধীর মত মুখ করে সুজাতা বললে, 'খেলা শেষ হবার আগেই খেলা ভেঙে গেল—'

'খেলা শেষ হয় নি এখনো। শুধু স্থগিত ছিল। আমি তোমার মত হড়বড় করে পায়ে বেড়ি পরি নি। এত দেশ ঘুরলাম, এত দিন ঘুরলাম, তবু তোমার কাছেই এলাম শেষ পর্যন্ত। মুলতুবি মামলার নিষ্পত্তি করতে।'

'জানি আসবে। আমার কাছেই আসবে। তোমাকে যে আমার দরকার—'

'তাহলে খেলা নয়?'

'না। লেখা। কপালের লেখা।'

'মানে?'

'মানে, তোমার কাছ থেকেই আমার পাওনা বুঝে নিতে হবে। সেইটিই হয়তো ভাগ্যের বিধান।'

উঠে গিয়ে সুজাতার হাত ধরলো ইন্দ্রনীল।

মনে হল পাশের ঘর থেকে শোভন বুঝি কেঁদে উঠল। কিংবা বেজে ওঠবার আগে টেলিফোনটা বুঝি ছোট্ট করে শব্দ করে উঠেছে।

ভয়ে থরথর করছে সুজাতা। বললে, 'লক্ষ্মীটি, আজ নয়। এখুনি নয়। কাল। আমি এখনো তৈরি হই নি—'

'মৃত্যুর জন্যে প্রতি মুহূর্তে আমরা তৈরি।' সুজাতার কানের কাছে মুখ আনল ইন্দ্রনীল

তবু শিথিল হয়ে সরে আসতে পেরেছে সুজাতা। বললে, 'পুজার যোগ্য সাজ করি নি, প্রসাধন করি নি। রচনা করি নি পরিবেশ। যে-মন মধু সে-মন এখনো খুঁড়ে আনি নি গভীর থেকে—' বলে চলে গেল পাশের ঘরে, শোভনের কাছে।

'দরজা বন্ধ করে দাও।' যেন কিছুই হয় নি এমনি সরল মুখে চলে গেল ইন্দ্রনীল।

'আজ এক পোস্টপিওনের গল্প শোনো।' পরদিন দুপুরে শোভনকে গল্প বলছে সুজাতা: 'পিওন দোতলার ফ্ল্যাটে কড়া নেড়ে বললে, মনি-অর্ডার আছে। মনি-অর্ডার শুনে কে না চঞ্চল হয়? ভদ্রমহিলা, নাম ইন্দিরা, যদিও একলা থাকে দুপুরে, চঞ্চল হয়ে খুলে দিল দরজা। কিন্তু পিওনের চেহারা দেখে ভড়কে গেল। যদিও পরনে খাকি প্যাণ্ট ও কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ, তবু তাকে সত্যিকারের পিওন বলে মন মানতে চাইল না। মুহূর্তে হুঁশিয়ার হয়ে গেল ইন্দিরা। জানত, খবরের কাগজে পড়েছিল, এমনি ভরদুপুরে ইলেকট্রিক-মিস্ত্রি টেলিফোনের মিস্ত্রি সেজে খুনে-ডাকাতেরা ফ্ল্যাটবাড়িতে ঢোকে, যে বাড়িতে স্ত্রী বা তার কোলের শিশু রেখে স্বামী অফিসে। এই যেমন ইন্দিরা, যার বাড়িতে সে ছাড়া এখন দ্বিতীয় প্রাণী নেই। ঠিক, যা ভয় করেছিল। ব্যাগ থেকে মনি-অর্ডারের ফর্ম কোথায়, মস্ত একটা সিল্কের রুমাল বের করল আগন্তুক। রুমালের তলায় ফর্ম; যেন রুমাল দিয়ে ফর্ম না জড়িয়ে আনলে চলে না। আপনার ভাই রমেশ—নামটা সংগ্রহ করেছে—পাঠিয়েছে টাকাটা। নিন, এই ফর্মে সই করুন এখানে। সই করার জন্যে কলম আনতে পিছন ফিরবে অমনি রুমাল নাকে চেপে ধরবে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইন্দিরা তার চেয়েও সাংঘাতিক। রুমাল দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠেছে, সাপ! সাপ! সাপ! আর সেই মুহূর্তে চোর-পিওন ভড়কে গিয়ে এক পলক নিষ্পলক হয়েছে, অমনি ইন্দিরা তার হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েছে রুমাল। এবার আর

জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা নয়, উলটে নিজেই এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে রুমাল চেপে ধরেছে পিওনের নাকে—

এ কি, এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে শোভন। কপালে আলতো করে একটু হাত রাখল সুজাতা। না, ঘুমিয়ে পড়েছে। চাইল না চোখ। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সুজাতা চুপিচুপি চলে গেল পাশের ঘরে।

কই, দরজায় আঙুলের গিঁটের শব্দ কই ?

দেরি হয়ে গেছে, তবু দেখা নেই। রাগ করেছে বোধহয়। সুরবাঁধা যন্ত্রের তার হয়তো ছিঁড়ে গিয়েছে।

টেলিফোন করবে নাকি ? আসতে বলবে ? মনে করিয়ে দেবে লগ্নের কথা ?

তাকাল টেলিফোনের দিকে। মনে হল যেন ওটা দুই জীবন্ত চোখে মুখ বুজে চেয়ে আছে, দেখছে। না, মানুষের মুখ না, ও দেখে না, কান না পাতলে সাধ্য কি ও কথা বলে ! এ সময় ফোন করে না প্রিয়ব্রত। পাছে শোভনের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। দরকার হলে সুজাতাই ফোন করে। করবে নাকি ?

ঠুক ঠুক ঠুক—

দরজা আজ ভেজানো। উঠে খুলে দিতে হল না সুজাতাকে।

সন্দেহ কি, সে আজ প্রতীক্ষা করে আছে। উৎসুক হয়ে আছে।

ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করল ইন্দ্রনীল। পাশের ঘরের দরজাটায় ছিটকিনি দিতে যাচ্ছিল, সুজাতা বাধা দিল। বললে, 'না, থাক। ও তো বিছানায় শোয়া। ঘুমের মধ্যে ককিয়ে উঠতে পারে, শুনতে পাবো না। যদি হঠাৎ চোখ চায়, দরজা বন্ধ দেখলে ভয় পাবে, চেঁচিয়ে উঠবে। পরদাটা শুধু টেনে দাও—'

তাই দিল ইন্দ্রনীল।

মনে তখন থেকে একটা খটকা লেগে আছে শোভনের। পিওনের নাকে যখন রুমাল রাখল, তখন পিওনের কী হল ? মারা গেল, না

শুধু অজ্ঞান হল। এটা কিন্তু মা পরিষ্কার করে দেয় নি—ঘুম ভেঙে চোখ চাইল শোভন।

এ কি, পাশের ঘরে ফিসফিসানি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কেন? এ কি, মা কোথায়? কারা পাশের ঘরে ঝাপসা-গলায় কথা কইছে? কান খাড়া করল শোভন? একটা আওয়াজ কি মা'র মত মনে হচ্ছে না? যেন কথা কইতে পাচ্ছে না, কে যেন গলা টিপে ধরেছে মনে হচ্ছে। আরেকটা ফিসফিসানি তবে কার? নিশ্চয় তবে চোর ঢুকেছে। মার নাকে বোধহয় ক্লোরোফর্মের রুমাল চেপে ধরেছে। তার মানে, মাকে বোধহয় মেরে ফেলল। এখনো বুঝি সময় আছে। শোনা যাচ্ছে মা'র শব্দ—

শোভন আস্তে-আস্তে উঠে বসল বিছানায়। টুঁ করল না একটুও। দুর্বল, পা কাঁপছে, তবু নেমে দাঁড়াল বিছানা ছেড়ে। দেয়াল ধরে-ধরে এগুতে লাগল পাশের ঘরের দিকে। পরদার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে আগে দেখি।

আর কথা নেই। ঠিক চোর। মার গলা টিপে ধরেছে। হারটা ছিনিয়ে নিয়েছে বুঝি। গা হাত গলা কেমন খালি-খালি দেখাচ্ছে।

বলা-কওয়া নেই, শোভন ঝাঁপিয়ে পড়ল ইন্দ্রনীলের উপর।

পিছন দিক থেকে চুপিচুপি এসেছে কেউ দেখতে পায় নি। অতর্কিত আক্রমণে আমূল শিউরে উঠেছে ইন্দ্রনীল। ঝটকা মেরে শোভনকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মেঝের উপর। সুজাতা উঠে পড়ে শোভনের কান ধরে কষিয়েছে দুই চড়। বললে, 'তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছ কী আক্কেলে। ওখান থেকে আমাকে ডাকতে পারো নি? তোমার এ ঘরে আসবার কী দরকার!'

কিন্তু কাকে বলছে সুজাতা? অজ্ঞান হয়ে পড়েছে শোভন।

কী হবে?

পালিয়ে গেল ইন্দ্রনীল।

সুজাতা প্রিয়ব্রতকে অফিসে ফোন করে দিল।

বাড়ি এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল প্রিয়ব্রত। বললে, 'কী করে হল?'

'জানি না।' সুজাতা বললে, 'আমি এই ঘরে ছিলাম, ও ঘুমুচ্ছিল ওই ঘরে। হঠাৎ দেখি টলতে-টলতে আসছে এ ঘরে, দেয়াল ধরে ধরে। ধরতে যাব, হাত বাড়াতে না বাড়াতেই পড়ে গেল মেঝের উপর। তুলে দেখি মাথায় রক্ত—'

কী রকম যেন মনে হচ্ছে। তুমিই বা ওকে ছেড়ে এ ঘরে এলে কেন? ও রোগা, বিছানায় শোয়া ছেলে, ওই বা কেন উঠল বিছানা ছেড়ে, কী ভেবে কোন সাহসে হাঁটল দেয়াল ধরে, চৌকাঠ ডিঙোলো? আর এ-ঘরে যদি এল, আসতেই পারল, পড়ল কেন? কেন পড়বার আগে দু-হাত বাড়িয়ে ওকে ধরা গেল না? নানা প্রশ্নে দগ্ধ হতে লাগল প্রিয়ব্রত।

ওর জ্ঞান হোক। ও সুস্থ হোক। ওর কাছ থেকেই জানা যাবে সমস্ত।

যেন ওর জ্ঞান না হয়। যেন আর ও চোখ না মেলে। এতখানি চোট পাবার পর অত রোগা ছেলে কখনো বাঁচে না, বাঁচতে পারে না। ও-ও যেন না বাঁচে।

জ্ঞান এসেছে। সুস্থ হয়েছে। আর ভয় নেই।

'কি করে পড়লে?' জিগগেস করল প্রিয়ব্রত।

মার দিকে তাকাল শোভন। অশ্রুভরা চোখে এক ঘর মমতা নিয়ে তাকে দেখছে সুজাতা। যাতে প্রিয়ব্রত দেখতে না পায় এমনি ভাবে ঘুরে গিয়ে দুই ব্যাকুল চোখে ইশারা করছে, যেন না বলে, যেন না বলে, যেন না বলে—

'কি করে পড়লে বাবা?' ছেলের কাছে ঝুঁকে পড়ে জিগগেস করল প্রিয়ব্রত।

'ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখি, মা কাছে নেই। কি খেয়াল হল,

মাকে খুঁজতে গেলাম পাশের ঘরে। টলতে-টলতে পড়ে গেলাম, মা ধরে ফেলল।' চোখ বুজল শোভন।

রাত্রে, অন্ধকারে, আধোঘুমের মধ্যে শোভনকে সুজাতা নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিল গাঢ় করে। অনর্গল আদরে বলতে লাগল তপ্তকণ্ঠে, 'তুই আমার শোভন, তুই আমার সাধন, তুই আমার একমাত্র।'

লেখক-পরিচিতি

পৈত্রিক নিবাস ফরিদপুর, জন্মগ্রহণ করেন নোয়াখালিতে, 'পশ্চিম প্রান্ত কুটিরে', তেরোশ দশ সনের দোসরা আশ্বিন তারিখে (১৯০৩ সেপ্টেম্বরে)। পিতৃবিয়োগের দুবছর পর ১৯১৮ সালে কলকাতায় আসেন, ভবানীপুর সাউথ স্বুবার্বন স্কুলে ভর্তি হন। দুবছর পর (১৯২০) ম্যাট্রিক পাশ করে সাউথ স্বুবার্বন (বর্তমানে আশুতোষ) কলেজে ঢোকেন। যখন আই-এ পড়ছেন তখন "প্রবাসীতে" নীহারিকা দেবী ছদ্মনামে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। (পরে যিনি স্ত্রী হয়ে আসেন দেখা যায় তাঁর নাম নীহারকণা।) যখন বি-এ পড়ছেন (১৯২৩-২৪) তখন "কল্লোল" পত্রিকার সংস্পর্শে আসেন। (বাঙলা সাহিত্যের সেই সব উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত দিনের কথা "কল্লোল যুগ" বইয়ে লেখা হয়েছে।) ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে ১৯২৪-এ বি-এ পাশ করেন। ১৯২৬-এ ইংরাজিতে এম-এ ও ১৯২৯-এ শেষ ল। যখন এম-এ পড়ছেন তখন প্রথম উপন্যাস "বেদে" লেখেন, এবং এ-বই রবীন্দ্রনাথের থেকে যে সম্ভাষণ আনে তা চিরকালের নবীন সাহিত্যিকের কাছে উৎসাহের উৎস হয়ে থাকবে।

১৯২৯ সালে ল পাশ করার পর আলিপুর কোর্টে ওকালতির সনদ নেন। একটি টাউট জোটে। ফৌজদারি কোর্টের অঙ্গনে তক্তপোশ ও মাদুর পেতে সেরেস্তা তৈরি হয়। মক্কেল কোথায়, কোর্টে কোর্টে ঘুরে ঘুরে বেড়ান, এক সময়ে খোদ জেলাজজের এজলাসে এসেও হাজির হন। সর্বসাধারণের ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে একবারও কি তখন ভেবেছিলেন যে একদিন তিনি নিজেই বসবেন ঐ মঞ্চের উপরে, ঐ পিঠতোলা মস্ত চেয়ারে ?

মাসান্তে টাউট এসে বললে, মাইনে চাই। মাইনে কিসের ? বলা হল, মামলা আনো কমিশন নাও। প্রস্তাবটা তার মনঃপূত হল না। পরদিন কোর্টে গিয়ে দেখেন মাদুর আর তক্তপোশ লোপাট হয়ে গিয়েছে। যে-ঠিকানা দিয়েছিল সেখানে টাউট থাকে না।

হাত ধুয়ে বাড়িতে এসে বসলেন সাহিত্য নিয়ে। মুন্সেফিতে ডাক পড়ল। ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বরে প্রথম পোস্টিং পান বহরমপুরে। সেই থেকে ১৯৫৮ সালে চব্বিশ পরগনার জেলাজজ রূপে রিটায়ার করার আগে পর্যন্ত বাঙলা দেশের বহু সদরে-মফস্বলে ঘুরেছেন, বহু আনাচে-কানাচে। জজিয়তির কাজ

ঠায় বসে শুধু লেখা আর লেখা, পড়া আর পড়া। সমস্ত দিন সাক্ষীর জবানবন্দি লিখে হাত ব্যথা করা, সমস্ত রাত রায় নিয়ে মাথাব্যথা করা। তবু তারই মধ্যে সাহিত্যের সাধনা করেছেন। ভ্রান্ত হন নি, ভ্রষ্ট হননি। সাতাশ বছর ধরে যত লেখা লিখেছেন ইংরেজিতে, জবানবন্দিতে আর রায়ে আর অর্ডারে, তা এক ঘর কোন না হবে, যদি তার কিছুও অন্তত লেখা হত বাঙলায়।

১৯৪৭-এ যখন মুর্শিদাবাদের কান্দিতে তখন ঘটনাচক্রে পরলোক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন। এমন কিছু কাণ্ড ঘটতে থাকে যার সহজ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা হয় না। আসানসোলে বাড়ি পেয়েছেন, টেবিলে খবর এল, "আত্মারা" আসতে প্রস্তুত নন যেহেতু বাড়িতে "ঠাকুর" বসানো হয় নি। একদিন কোর্ট থেকে ফিরছেন, রাস্তার ধারের এক দোকানদার একখানা ক্যালেণ্ডার উপহার দিল, সে ক্যালেণ্ডারে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। বাড়ি এসে যেমন ক্যালেণ্ডার রাখে তেমনি রাখলেন দেয়ালে টাঙিয়ে। তারপর "আত্মাদের" আবার যখন ডাকা হল অন্য উপলক্ষে, তখন টেবিল নিজের থেকে ছুটে গিয়ে প্রবল বেগে দেয়ালে ধাক্কা মারল, যে-দেয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি টাঙানো। জিগগেস করা হল, কী ব্যাপার? "আত্মারা" লিখলে: 'এবার সত্যিকার ঠাকুর এনে বসিয়েছ।' এর কদিন পরেই জি-টি রোডের উপর স্ত্রীর পায়ে সর্পদংশন হয়। যে গাড়ি দৈবাৎ এগিয়ে আসে হাসপাতালে নিয়ে যেতে, দেখা যায় তাতে, সিটের উপর, কখানা বই সে বই স্বামী সারদানন্দের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।"

সেই থেকে শ্রীরামকৃষ্ণে আকৃষ্ট হন—ক্রমে ক্রমে আবিষ্ট।

ভূমি থেকে ভূমা, সর্বক্ষেত্র থেকেই সাহিত্যের বিষয় খুঁজে নিয়েছেন। বৈচিত্র্য আর বহুত্বই তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। চাষাভুষা, হাড়ি মুচি ডোম থেকে শুরু করে রূপসী রাত্রি। কবিতায় অমাবস্যা থেকে নীল আকাশ। মাঝখানে আবার রস রচনা, ইনি আর উনি। আঙ্গিকের নবীন ও সার্থক চারুকারু। বাঙলা সাহিত্যে একটি বিশেষ লিখনশৈলীর প্রবর্তক। যেমন এক অঙ্গে এত রূপ তেমনি আবার স্বাদু স্বাদু পদে পদে।

দৃঢ়স্পষ্ট উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যেমন দীপ্তকণ্ঠ বক্তা তেমনি ভাবস্নিগ্ধ কথক। কথনেও নতুন শৈলীর প্রণেতা। ভগবৎপ্রসঙ্গের চমৎকারিতায় হাজার হাজার শ্রোতাকে তন্ময় রাখার জাদু জানা লোক—যে জাদুর আরেক নাম ভক্তি।